জীবন জাগার গল্প-৭

হুদহুদের দৃষ্টিপাত

মুহাম্মাদ আতীকুল্লাহ

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ।

শিক্ষক পিতা ও গৃহিনী মায়ের চতুর্থ সন্তান। খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়িতে জন্ম। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পাহাড়ঘেরা পার্বত্য জনপদে। বনবাদাড়ের ভয়জাগানো আদিম আবহাওয়ায়। স্রোতস্বিনী পাহাড়ী নদীর বিক্ষুব্ধ স্রোতে সাঁতার খেলে। বহু উপজাতির নানাবিধ বৈচিত্র্যময় সমাজে। পিত্রালয় ও মাতুলালয় ফেনীর ভাবগম্ভীর ধর্মীয় আবহে। পড়াশোনার সূত্রে সময় কেটেছে গ্রামবাঙলার নিটোল পল্লীর গ্রামীণ পরিবেশে। প্রাচীন ধারার কওমী মাদরাসার আমলি পরিবেশে।

পড়াশোনার হাতেখড়ি বাবা ও মায়ের কাছে। মাদরাসাজীবন কেটেছে, মামা মাওলানা সাইফুদ্দীন কাসেমী (দা বা)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। তিনি হাকীমুল উম্মতের অন্যতম প্রধান খলীফা মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী রহ.-এর খাস সোহবতপ্রাপ্ত। ফেনীর ঐতিহ্যবাহী জামিয়া মাদানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম।

ফলে মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ বেড়ে উঠেছেন খানকাহী মেজাজে, সুনিপুণ তরবিয়তের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই তার মাঝে দাওয়াত, তালীম, জিহাদ ও খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াতের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

নব্বুইয়ের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক শাসক ও শান্তিবাহিনীর দৌরাত্ম্যে সৃষ্ট হওয়া টানটান উত্তেজনাময় পরিস্থিতি, তার মনমননে গভীর রেখাপাত করেছে। পাশাপাশি এই দশকের অবিস্মরণীয় ঘটনা, আফগান জিহাদ তাকে দিয়েছে ভিন্নধর্মী এক চেতনা। বিশ্ব রাজনীতি ও মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে তার আছে গভীর পাঠ।

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া পটিয়া থেকে তিনি তাকমীল (দাওরায়ে হাদীস) সমাপ্ত করেছেন। কুরআনের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম প্রতিষ্ঠা করে। যার অন্যতম লক্ষ্য কুরআনের আলোয় আলোকিত সমাজ বিনির্মাণ। মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ স্বভাবগতভাবে নিভৃতচারী হলেও কাছের মানুষরা জানে তিনি বেশ রসিক মানুষ। বই পড়া তার পেশা ও নেশা। অনলাইনে পঞ্চাশেরও অধিক শিরোনামে ধারাবাহিক লেখা লিখে চলছেন বিরামহীনভাবে।

তার লিখিত জীবন জাগার গল্প সিরিজের লেখাগুলো বেশ সুখপাঠ্য। পাঠক অবচেতনমনেই আকৃষ্ট হয় কুরআনের প্রতি। ইতিহাস বিষয়ক তাঁর লেখাগুলো আমাদেরকে জাগিয়ে তোলে গাফলাতের সুখনিদ্রা থেকে। উদ্বুদ্ধ করে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে। আল্লাহ তাঁর কলমকে আরও শাণিত করুন। গোটা বিশ্বকে কুরআনি আলোয় আলোকিত করুন।

—প্রকাশক

হার

হুদহুদের দৃষ্টিপাত

[জীবন জাগার গল্প-৯]

মুহাম্মাদ আতীকুল্লাহ

শিক্ষক

তারজামাতু মা'আনিল কুরআন, সীরাত, ইতিহাস

মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

শ্যামলী, ঢাকা

মাকতাবাতুল আযহার

উৎসর্গ

আবু বকর রা. কেন সবার সেরা? তার অনেক অনেক কারণ আছে! তিনি পুরো বিশ্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তার দৃঢ় অবস্থান এতই সময়ের চেয়ে এতই প্রাগ্রসর ছিল, উমর রা.-এর মতো মানুষও প্রথমে একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। উম্মতের এই দুর্যোগময় সময়ে খলীফায়ে আউয়ালের আদর্শকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এমন একজনকে!

রাব্বে কারীম তার মেহনতকে কবুল করে নিন। আমীন।

শুরুর কথা

হুদহুদ পাখি কোনটা? আমাদের দেশের কাকাতুয়া! অথবা কাঠঠোকরা! কাকাতুয়া আর কাঠঠোকরা হুবহু এক পাখি নয়। জাতিতে এক হলেও প্রজাতি ভিন্ন! বিশ্বে প্রায় ২০০ প্রজাতির কাঠঠোকরা আছে। বাংলাদেশে আছে তিনটি প্রজাতি। আমার কৌতূহল জাগে, কুরআনে বর্ণিত ঘটনায় যে হুদহুদের কথা বলা হয়েছে, সেটাকে যদি কাঠঠোকরা বা কাকাতুয়া ধরে নিই, তাহলে সেটা কোন প্রজাতির? সেটা জানার আজ আর কোনও উপায় নেই! তার বোধ হয় প্রয়োজনও নেই! প্রয়োজন থাকলে আল্লাহ নিজ থেকেই জানিয়ে দিতেন!

❖

আমরা কেন আজ হুদহুদ নিয়ে পড়লাম? গল্পের বইয়ের সাথে হুদহুদের কী সম্পর্ক? বর্তমান হলো পরিসংখ্যানের যুগ! আপাত সম্পর্কহীন দুই মেরুতে অবস্থান করা দু'টি বিষয়কেও নানা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দেখানো হয় দুইয়ের মধ্যে কতো মিল! দুটিতে কী মিল! আমরা বইয়ের নামে হুদহুদ কিভাবে উড়ে এল? একটু খতিয়ে দেখা যাক! হুদহুদের কাজ কী ছিল?

❖

সুলাইমান আ. দরবারে বসেই হাজিরা ডাকলেন। হুদহুদ অনুপস্থিত! কোথায় গেল পাখিটা? হুদহুদ তো কোনও কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকার কথা নয়! একটু পরেই হুদহুদ খবর নিয়ে এলো,

-আমি সাবাজাতি সম্পর্কে দারুণ এক সংবাদ নিয়ে এসেছি!

-কী সংবাদ?

-আমি এক মহিলাকে প্রবল প্রতাপে দেশ শাসন করতে দেখে এসেছি। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সে দেশের প্রজারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের পূজা করছে।

❖

তার মানে হুদহুদ ছিল 'স্যাটেলাইট'। উপর থেকে চারদিকে নজরদারি করতো। কারা কী করছে! শুধু তাই নয়, হুদহুদ একজন মৃত্তিকাবিজ্ঞানীও ছিল। সুলাইমান আ. যখন মরুভূমি দিয়ে সসৈন্যে কোথায় যেতেন, পানি-সংকট দেখা দিত। হুদহুদ উপর থেকে বলে দিতে পারতো কোথায় মাটির নিচে পানি আছে। এমন একটা পাখির ড্রোন থাকলে, একটা বাহিনী অপরাজেয় হয়ে উঠতে আর কোনও বাধা থাকে না!

❖

আমাদের কথা অন্যদিকে চলে গেছে। আমরা হুদহুদ থেকে একটা শিক্ষাই নিতে চেয়েছি।

-গভীর পর্যবেক্ষণ!

আমরা চারপাশের ঘটনাবলীকে হুদহুদের দৃষ্টিতে দেখার অভ্যেস করতে পারলে, অনেক হীরে-জহরত বের হয়ে আসবে। দেখার ভিন্নতার কারণে, সাধারণ একটা পিঁপড়ার হাঁটা থেকেও জীবনের গভীর পাঠ সংগ্রহ করা যায়। আমরা একটা ঘটনাকে সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে দেখার পাশাপাশি, অবস্থান বদলে নতুন দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছি।

❖

হুদহুদ নিজের বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে কী বলেছে? তার কথাই শুরু করেছে (أحطت) আহাত্তু। ইহাতা মানে?

= একটা বিষয়কে সবদিক থেকে জানা। পরিপূর্ণভাবে জানা।

আল্লামা ইবনে আশুর রহ. এর কুরআনী তাদাব্বুর অসাধারন। তিনি উনিশ শতকের মানুষ হলেও, চিন্তার গভীরতা ও কুরআনের গভীরে ডুব দেয়ার যোগ্যতা ছিল অনেকটা সালাফের মতো। তিনি 'ইহাতা' শব্দের ব্যখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,

-একটা বিষয়কে সার্বিকভাবে ধারণ করা। বিষয়টা অনেক এমন: একটা গোলাকৃতির পাত্রের মধ্যে কোনও কিছু রাখলে, ওটা পুরোপুরি আয়ত্তের মধ্যে থাকে। নিয়ন্ত্রণে থাকে, ইহাতা মানেও এমনি। হুদহুদ বিলকিস সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ নিয়ে এসেছিল।

❖

আমরা চেষ্টা করবো, দৈনন্দিন জীবনেও, হুদহুদের গুণটা অর্জন করতে। প্রিয় মানুষগুলোর একটা দিক দেখেই বিচার করতে বসে যাবো না। যা ভাবছি, বাস্তবে তা নাও হতে পারে। মনটাকে একটু শাসিয়ে, অন্যের অবস্থান থেকেও ঘটনাটা যাচাই করে দেখার চর্চা করবো। সুখে থাকার জন্যে এটুকু করা যেতেই পারে, কী বলেন?

সূচিপত্র

জীবন জাগার গল্প ৫৩০ : আই লাভ ইউ ম্যান ১১
জীবন জাগার গল্প ৫৩১ : মহৎপ্রাণ ডাক্তার............................ ১৪
জীবন জাগার গল্প ৫৩২ : হিসাব-নিকাশ ১৬
জীবন জাগার গল্প ৫৩৩ : মেধার মানদণ্ড ১৭
জীবন জাগার গল্প ৫৩৪ : ঘরের উপদেশ ১৮
জীবন জাগার গল্প ৫৩৫ : বিল-বদান্যতা ১৯
জীবন জাগার গল্প ৫৩৬ : তিন শিষ্য ২০
জীবন জাগার গল্প ৫৩৭ : রকমারি ২২
জীবন জাগার গল্প ৫৩৮ : টেলিভিশন ২৩
জীবন জাগার গল্প ৫৩৯ : ভালোবাসা ২৫
জীবন জাগার গল্প ৫৪০ : সন্ত্রাসের সংজ্ঞা ২৭
জীবন জাগার গল্প ৫৪১ : পিতার সংজ্ঞা ২৮
জীবন জাগার গল্প ৫৪২ : পিতা পুত্রকে ৩০
জীবন জাগার গল্প ৫৪৩ : তারা ও আমরা ৩১
জীবন জাগার গল্প ৫৪৪ : মুনাযারা ৩১
জীবন জাগার গল্প ৫৪৫ : লিফট আরোহিনী ৩৩
জীবন জাগার গল্প ৫৪৬ : অমূল্য শিক্ষা ৩৪
জীবন জাগার গল্প ৫৪৭ : মহীরূহ............................ ৩৭
জীবন জাগার গল্প ৫৪৮ : রিকশা চালিয়ে হজ্জ ৩৯
জীবন জাগার গল্প ৫৪৯ : রাজার নামায............................ ৪২
জীবন জাগার গল্প ৫৫০ : কৃপণের মেহমানদারি ৪৩
জীবন জাগার গল্প ৫৫১ : বেদুঈনের দু'আ ৪৩
জীবন জাগার গল্প ৫৫২ : ফেসকৌতুক ৪৩
জীবন জাগার গল্প ৫৫৩ : অবস্থানের পার্থক্য ৪৫
জীবন জাগার গল্প ৫৫৪ : ময়দান থেকে ময়দানে ৪৫
জীবন জাগার গল্প ৫৫৫ : চেইন অব হ্যাপিনেস ৪৮

জীবন জাগার গল্প ৫৫৬ : আকাশসম মন ৫০
জীবন জাগার গল্প ৫৫৭ : তুমি চলে গেছ অনেক দূরে! ৫১
জীবন জাগার গল্প ৫৫৮ : অজ্ঞ-বিজ্ঞ ৫৩
জীবন জাগার গল্প ৫৫৯ : মিনা প্রান্তরের কালো মেয়ে! ৫৩
জীবন জাগার গল্প ৫৬০ : শেষ চিঠি ৫৪
জীবন জাগার গল্প ৫৬১ : একটি মেয়ের বায়োডাটা ৫৫
জীবন জাগার গল্প ৫৬২ : টিকটিকর খাবার ৫৬
জীবন জাগার গল্প ৫৬৩ : দরবেশের ছুটি ৫৮
জীবন জাগার গল্প ৫৬৪ : দুনিয়ার হাকীকত ৫৯
জীবন জাগার গল্প ৫৬৫ : কুদস ও আমি ৬০
জীবন জাগার গল্প ৫৬৬ : ফাদারের প্রশ্নমালা ৬১
জীবন জাগার গল্প ৫৬৭ : কেমন জীবন চাই ৬৫
জীবন জাগার গল্প ৫৬৮ : জাদুর পানি পড়া ৬৫
জীবন জাগার গল্প ৫৬৯ : রিযিক ৬৮
জীবন জাগার গল্প ৫৭০ : হাসির স্কুল ৬৯
জীবন জাগার গল্প ৫৭১ : মহিয়সী মুজাহিদা ৭২
জীবন জাগার গল্প ৫৭২ : দুই মায়ের পার্থক্য ৮০
জীবন জাগার গল্প ৫৭৩ : চার দিরহামের দু'আ ৮১
জীবন জাগার গল্প ৫৭৪ : একবেলা আহার ৮৩
জীবন জাগার গল্প ৫৭৫ : আরবের পরিণতি ৮৪
জীবন জাগার গল্প ৫৭৬ : বাবার দেনা! ৮৬
জীবন জাগার গল্প ৫৭৭ : পাঁচ মিনিট ৮৭
জীবন জাগার গল্প ৫৭৮ : দুঃসাহসী গোয়েন্দা ৮৯
জীবন জাগার গল্প ৫৭৯ : জানা-শোনা=অশান্তি ৯১
জীবন জাগার গল্প ৫৮০ : বাবার সেবা! ৯৩
জীবন জাগার গল্প ৫৮১ : জান্নাতের চাবি ৯৬

জীবন জাগার গল্প: ৫৩০

আই লাভ ইউ, ম্যান!

এক

গারে সাওর পার হয়ে এসেছেন। সুরাকাহ বিন মালিক সুসংবাদ নিয়ে ফিরে গেছে। তার অবাক চোখে এখন কিসরার বালার স্বপ্ন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কব্জি দেখছেন আর বিড়বিড় করছেন,

–মুহাম্মাদ এটা কী বললো? আমার হাতে কিসরার বালা?

ওদিকে দু'জন মানুষ মরু-পাহাড় ডিঙ্গিয়ে মদীনার পানে। ভীষণ পিয়াস লেগেছে। আবু বকর বলেন,

-খাবারের সন্ধানে বের হলাম। অনেক খুঁজে এক পেয়ালা দুধ পেলাম। ভীষণ ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও নিজে না খেয়ে নবীজির জন্যে নিয়ে এলাম,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিন পান করুন।

তিনি তৃপ্তি ভরে পান করলেন। তারপর আমি পান করলাম।

= আবু বকর! হে ম্যান, এভাবে ভালোবাসতে শিখলেন কিভাবে?

দুই

মক্কা বিজয় হয়েছে। এখনো আবু কুহাফা ঈমান আনেননি। বয়েসের কারণে বুড়ো অন্ধ হয়ে গেছে। আবু বকর বাবাকে হাত ধরে ধরে দরবারে নিয়ে এলেন। এতদিনে বুড়োর মতি হয়েছে ইসলাম আনার। নবীজি দেখে বললেন,

-এই রে! বুড়ো মানুষটাকে কষ্ট দিয়ে না আনলে কি হতো না! আমরাই তার কাছে যেতাম!

-তা কী করে হয়! আপনার আসাটাই শোভনীয়! আপনার কাছেই সবাইকে আসতে হয়!

.

বুড়ো আবু কুহাফা এখন মুসলমান। আবু বকরের চোখে অশ্রু। সবার প্রশ্ন,

- আজ তো আনন্দের দিন! বাবা মুসলমান হয়েছে। জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেয়েছে। এরপরও আপনি কাঁদছেন?

-আমি কাঁদছি কষ্টে!

-কিসের কষ্ট?

-আজ আমার বাবা না হয়ে যদি আজ আবু তালেব ইসলাম গ্রহণ করতেন, তাহলে নবীজি আরো কতো বেশি খুশী হতেন?

= আজব! ম্যান! আপনি এভাবে ভালোবাসতে শিখলেন কোন ইশকুলে?

তিন

ছিলেন দাস। নবীজী তাকে আযাদ করেছেন। একবার নবীজি পুরো দিন অনুপস্থিত। খাদেম সাওবানের সাথে দেখা হলো না। চেহারা মলিন হয়ে গেলো। অস্থির হয়ে গেলেন। পরে যখন দেখা হলো, হু হু করে কেঁদে দিয়ে সাওবান বললেন,

- আপনার অসাক্ষাতে বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করছিলাম।

-সাওবান! শুধু আমাকে না দেখার কারণেই তোমার কান্না পেয়েছে?

-জি না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে চিন্তা উদয় হয়েছে, জান্নাতে আপনি কোথায় থাকবেন আর আমি কোথায় থাকবো, দু'জনের মর্যাদা তো এক হবে না! সেখানে আমি আপনাকে ছাড়া থাকবো? বড় একাকী লাগবে যে!

এবার সরাসরি রাব্বে কারীম আলোচনায় অংশ নিলেন। তিনি জিবরাঈলকে দিয়ে বলে পাঠালেন,

-যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা নেয়ামতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে.......... (সূরা নিসা: ৬৯)।

= এটা কেমন ভালোবাসা?

চার

সাওয়াদ বিন আযিয়্যাহ। ওহুদ-ময়দানের একজন 'ইস্তেশহাদী'। শাহাদাতের তামান্না নিয়েই 'ব্যাটেলফিল্ডে' এসেছেন। চীফ ইন কমান্ড সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন। জোরে হাঁক দিয়ে বললেন,

–এটেনশান, লাইনআপ!

সাহাবায়ে কেরাম তীরগতিতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। একচুল পরিমাণ এলোমেলো ভাব নেই। নবীজি অভিজ্ঞ চোখে দেখলেন, সাওয়াদ পুরোপুরি লাইনে দাঁড়ায়নি। হাঁক পাড়লেন,

–সাওয়াদ! সোজা হয়ে দাঁড়াও!

কিন্তু তারপরও ঠিক হলো না। এবার নবীজী এসে মিসওয়াক দিয়ে তার পেটে দিলেন এক খোঁচা।

–আপনি আমাকে কষ্ট দিয়ে ফেলেছেন! আপনাকে আল্লাহ হক প্রতিষ্ঠার জন্যে পাঠিয়েছেন। আমি এর বদলা চাই!

নবীজী সাথে সাথে নিজের পেট উদোম করে বললেন:

–বদলা নিয়ে নাও!

সাওয়াদ নবীজীর উদোম পেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে চুমো দিতে শুরু করলেন,

–ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটাই আমি চেয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস, আজ শাহাদাতের দিন। একটা শেষ ইচ্ছা ছিল, আপনার মুবারক 'বদন'-এর সাথে আমার শরীরটা একটু ছোঁয়াই!

পাঁচ

এখন মসজিদে যে ধরনের মিম্বর আছে, শুরুর দিকে তার প্রচলন ছিল না। নবীজি একটা খেজুর গাছের গুঁড়ির সাথে হেলান দিয়ে বক্তব্য দিতেন। পরে মিম্বরের ব্যবস্থা হলো। নবীজি ভাষণ দেয়ার জন্যে মিম্বরে চড়লেন।

বিচ্ছেদ জ্বালা সইতে না পেরে, খেজুর-গুঁড়িটা (উস্তুয়ানা) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল। নবীজি দ্রুত নেমে এসে, ওটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন:

–তোমাকে এখানে দাফন করা হবে, জান্নাতেও আমার সাথে থাকবে, এতে কি তুমি সন্তুষ্ট?

কান্না বন্ধ হলো।

= ভালোবাসার এতই শক্তি!

ছয়

সা'দ বিন রবী। একজন আনসার। বেশ সম্পদশালী মানুষ। নবীজিকে অসম্ভব ভালোবাসেন। নিজের দুই বিবি ও অসংখ্য ছেলেসন্তান থাকলেও মন পড়ে থাকতো দরবারে নববীতে। ওহুদ যুদ্ধে রক্তাক্ত মুহূর্ত।

.

একটা আশার কথা, নবীজি বলেছেন,

–তুমি যাকে ভালোবাসো, তার সাথেই থাকবে।

আনাস (রা.) বলেছেন, জীবনে সবচে বেশি খুশি হয়েছি এই হাদীসটা শুনে।

আমি অধমও বলি, আমার পুঁজি হলো এই হাদীস। আমল দিয়ে তো সাহাবায়ে কেরামের মতো নবীজিকে ভালোবাসতে পারবো না। সেটা শুধু অসম্ভবই নয়, আরও বেশি কিছু। কিন্তু একটা দিক দিয়ে আমি নিশ্চিত সাহাবায়ে কেরামের সমকক্ষ হতে পারবো,এতে কোনও সন্দেহ নেই। কোন দিকটাতে?

= তারা নবীজির আদর্শ-সুন্নাহকে ধারণ করার পাশাপাশি মুখেও সবসময় নবীজির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। আমি আমলে সাহাবায়ে কেরাম থেকে যোজন যোজন পিছিয়ে। কিন্তু মুখে ও মনে মনে সব সময় বলি:

= আই লাভ ইউ, ম্যান! ইয়া রাসূলাল্লাহ!

<u>সাত</u>

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহু।

জীবন জাগার গল্প: ৫৩১

মহৎপ্রাণ ডাক্তার

ডাক্তার একটানা বারো ঘণ্টার ডিউটি শেষ করে বাসায় এলেন।

হাসপাতাল থেকে জরুরি কল এলো।

–স্যার, কল করার জন্য দুঃখিত। আমি জানি আপনার অবস্থা। তবুও কল না করেও উপায় নেই। অত্যন্ত মুমূর্ষ একটা ছেলে ভর্তি হয়েছে। ছেলেটাকে এখুনি ওটিতে নিয়ে যেতে হবে। দ্রুত অপারেশন প্রয়োজন।

–ঠিক আছে, আমি যত তাড়াতড়ি সম্ভব আসছি।

ডাক্তার হাসপাতালে এলেন। অপারেশন থিয়েটারের সামনে রুগির আত্মীয়-স্বজন ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার এ্যাপ্রন পরে অপারেশান থিয়েটারের সামনে যেতেই এক লোক তেড়ে এলো। চেহারা পাগলপ্রায়। রূঢ়ভাবে জানতে চাইলো,

–আপনিই বুঝি কর্তব্যরত ডাক্তার?

–জি।

–হাসপাতালের কাজ ফেলে আপনারা কোথায় গিয়ে বসে থাকেন? এদিকে রুগি অপারেশনের অভাবে মারা যাচ্ছে।

–রুগি আপনার কে হয়?

–আমার ছেলে। আপনাদের মনে তো দয়ামায়া নেই। থাকলে কাজ ফেলে বাইরে থাকতেন না। আপনাদের দায়িত্ববোধ বলতে কিছু নেই।

–আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আমি হাসপাতালে ছিলাম না। বাড়িতে ছিলাম। ফোনকল পেয়ে এইমাত্র এসেছি। আপনি একটু শান্ত হোন। আমাকে কাজটা শুরু করতে দিন।

–শান্ত হতে বলছেন? আপনার ছেলের এমন শোচনীয় অবস্থা হলে তখন বুঝতেন। আমার ছেলে মারা যাচ্ছে, তার যন্ত্রণা আমিই বুঝি। লোকটা ঝাঁঝালো স্বরে বললো।

–হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে। আপনি দু'আ করতে থাকুন।

–অন্যকে উপদেশ দেয়া খুবই সহজ।

ডাক্তার আর কথা না বাড়িয়ে মুখে মাস্ক আর হাতে গ্লাভস পরে ওটিতে চলে গেলেন। দুই ঘণ্টা পর বের হয়ে এসে বললেন,

–আপারেশন সফল হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আপনার ছেলে এখন আশংকামুক্ত। বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা। একথা বলেই ডাক্তার হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেলেন।

লোকটা অসহিষ্ণু হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নার্সকে বললো,

–দেখলেন ডাক্তারের কাণ্ড! আরেকটু সময় থেকে গেলে কী হতো? অপারেশানের পর রুগির কত কিইতো হতে পারে।

নার্স বললো,

–আপনি কাকে কী বলছেন? আজ সকালে স্যারের ছেলে স্কুল থেকে ফেরার পথে রোড এক্সিডেন্টে মারা গেছে। আর গত বারো ঘণ্টা স্যার একটানা ডিউটি করেছেন। ডিউটি সেরে বাসায় গিয়েই ছেলের মৃত্যুর সংবাদ শোনেন। এখনো বোধহয় স্যারের ছেলের কাফন-দাফনও হয়নি।

জীবন জাগার গল্প: ৫৩২

হিসাব-নিকাশ

ছেলে ঘরের কাজ করতে চায় না। বাবার কাছে, দাদা-দাদুর থেকে প্রশ্রয় পেয়ে অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। দাদা তো নাতিকে কিছু হলেই টাকা হাতে দিয়ে দেয়। এখন নাতি টাকা ছাড়া কিছুই বোঝে না। বাজার থেকে সামান্য পাউরুটি আনতে বললেও সে নিজের জন্য আলাদা করে টাকা দাবি করে।

ছেলে একদিন দাদার সাথে শলা-পরামর্শ করে মায়ের হাতে একটা তালিকা ধরিয়ে দিলো,

–আমাকে প্রতিদিন টাকা দিতে হবে। না হলে কাজগুলো আমি করবো না।

১. দুই বেলা টবে পানি দেয়া- ৫ টাকা।

২. দোকান থেকে এটা-সেটা কিনে আনা- ৫ টাকা।

৩. ছোট ভাইকে কোলে নেয়া- ৫ টাকা।

৪. ময়লার গাড়ি আসলে ময়লাগুলো নামিয়ে দিয়ে আসা- ৫ টাকা।

৫. ভালোভাবে লেখাপড়া করা- ৫ টাকা।

৬. নিজের বিছানা নিজে করা- ৫ টাকা।

৭. স্কুলের টিফিন- ২০ টাকা।

৮. প্রতিদিন ধোয়া কাপড়গুলো ছাদে দেয়া ও নিয়ে আসা- ৫ টাকা।

৯. কেউ কলিং বেল টিপলে দরজা খোলা ও বন্ধ করা- ৫ টাকা।

১০. আব্বুর পাখিটাকে খেতে দেয়া- ৫ টাকা।

সব মিলিয়ে আমি প্রতিদিন পঁয়ষট্টি টাকার কাজ করি। কিন্তু আমি একটা টাকাও পাই না। চাইলে আরো বকুনি খেতে হয়।

মা মুচকি হেসে ছেলের দেয়া হিসাব-নিকাশ পড়লেন। আরেকটা কাগজ নিয়ে লিখতে শুরু করলেন।

১. তোমাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করা বিনা পয়সায়।

২. তোমার জন্য রাতের পর রাত জেগে থাকা বিনে পয়সায়।

৩. তোমাকে দুধ পান করানো বিনে পয়সায়।

৪. তোমার অসুখ-বিসুখ হলে সেবাযত্ন করা বিনে পয়সায়।

৫. তোমাকে গোসল করানো, দাঁত ব্রাশ করানো, সাজিয়ে দেয়া বিনে পয়সায়।

৬. তোমাকে গল্প বলে, ছড়া পড়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া বিনে পয়সায়।
৭. তোমার পেশাব করা ভেজানো কাঁথা ধোয়া, স্কুলের ময়লা জামা কাপড় ধোয়া বিনে পয়সায়।
৮. তোমার লেখাপড়া দেখিয়ে দেয়া, বাড়ির কাজ করে দেয়া বিনে পয়সায়।
৯. তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, স্কুলে আনা-নেয়া করা বিনে পয়সায়।
১০. তোমাকে সপ্তাহে একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া বিনে পয়সায়।
১১. তোমাকে পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে এমনকি নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসা বিনে পয়সায়।
১২. এমন আরো অসংখ্য কাজ বিনে পয়সায়।

তুমি চাইলেও এসবের কোনও প্রতিদান আমাকে দিতে পারবে না। তুমি কেন, পৃথিবীর কেউ কখনো পারবে না।

জীবন জাগার গল্প: ৫৩৩

মেধার মানদণ্ড

জেলা শহরের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। শতবর্ষ পুরানো, বিখ্যাত এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন বড় কর্তা। আজকাল জেলা শহরগুলোতেও যানজট লাগে। শহরের প্রবেশ মুখেই পরিদর্শকের গাড়ি যানজটে আটকা পড়ল। আস্তে আস্তে এগুচ্ছে গাড়ি। শহরের ভেতরে এসে গাড়িটা নিজে নিজেই থেমে গেল। চাকার মধ্যে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে।

পরিদর্শক গাড়ি থেকে নেমে হয়রান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ির চালকও অসহায় হয়ে গাড়িটাকে অযথাই ঠেলাঠেলি করছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

এমন সময় স্কুলড্রেস পরিহিত এক কিশোর গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস করলো,

–গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে কেন?

–চাকাতে কী যেন সমস্যা হয়েছে।

–কই দেখি, গাড়ির টুলবক্সটা কোথায়? একটা রেঞ্জ লাগবে।

ছেলেটা গাড়ির নিচে গিয়ে কিছুক্ষণ ঠুকঠাক করে বের হয়ে এলো। পুরো গায়ে ধুলো লেপ্টানো। আপাদমস্তক ঝাড়তে ঝাড়তে বললো,

–এবার ঠিকমত চলবে। সমস্যা দূর হয়েছে।

পরিদর্শক মায়াভরা দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন:

–তুমি এই বয়েসেই এত ভালভাবে গাড়ি ঠিক করতে শিখে গেছো? একটুতেই বুঝে গেলে কোথায় সমস্যা হয়েছে। কিভাবে শিখলে?

–আব্বুর কাছে। তিনি একজন মোটর মেকানিক।

–তোমার হাতে বই দেখছি। পড়াশুনাও করো?

–জি। করি। আজও স্কুলে গিয়েছিলাম।

–স্কুল ছুটির আগেই ফিরে এলে যে?

–আমি আসতে চাইনি। আমাকে চলে আসতে বলেছে।

–কে?

–স্যারেরা।

–কেন?

–আজ আমাদের স্কুলে একজন অফিসার আসবেন। স্কুলের ছাত্রদের লেখাপড়ার অবস্থা যাচাই করে দেখবেন। তাদের মেধা পরীক্ষা করে দেখবেন। আমি পরীক্ষায় টেনেটুনে পাশ করলেও অতটা মেধাবী ছাত্র নই। সেজন্য স্যারেরা ঠিক করেছেন,

=আমার মতো যারা পড়ালেখায় দুর্বল তাদেরকে আজ পরিদর্শকের সামনে পড়তে দিবেন না। তাহলে যে স্কুলের বদনাম হবে।

জীবন জাগার গল্প: ৫৩৪

ঘরের উপদেশ

কামরায় বসে আছে রাইয়ান। মন খারাপ। পরীক্ষাটা ভালো হয়নি। এমন সময় স্যার আসলেন। জিজ্ঞেস করলেন,

–কি ব্যাপার মন খারাপ করে বসে আছো কেন?

–আবারও পরীক্ষাটা ভালো হয়নি। ভেতরটা হতাশায় ছেয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আমাকে দিয়ে হবে না। কোনও কাজেই উৎসাহ পাচ্ছি না।

–দেখ, তুমি চাইলে তোমার আশপাশ থেকেই উৎসাহ-প্রেরণা সংগ্রহ করতে পারো। নিজেকে নতুন করে গঠন করার পাথেয় খুঁজে নিতে পারো।

–কিভাবে?

–আমি সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করি, জীবনে সফলতার উপকরণগুলো কী কী?

=ঘরের ছাদ আমাকে বলে, তুমি আমার মতো উঁচুতে থাকার প্রতিজ্ঞা করো। উঁচু হিম্মতের অধিকারী হও।

= ঘরের জানালাগুলো আমাকে বলে, আগামীকালের চিন্তা করো। তোমার ভবিষ্যত নিয়ে ভাবো। বাইরের জগতের দিকে দৃষ্টি রাখো।

= দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ি আমাকে বলে, সময় খুবই মূল্যবান। সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

= ঘরের আয়না আমাকে বলে, তুমি নিজেকে দিয়েই পরিবর্তন শুরু করে দাও। নিজের দোষগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে দূর করো। নিজেকে সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তোল।

= ঘরের দরজা আমাকে বলে, সজোরে ধাক্কা দাও। যে কোন বন্ধ দরজা শক্তি দিয়ে খুলে ফেলো। ভেতরে প্রবেশ করে হীরা-জহরত নিজের অধিকারে নিয়ে এসো।

= আলনার পোশাকাশাক আমাকে বলে, সবসময় নিজের আরো ভালো কিছুর জন্য পরিবর্তন করতে থাকো। তোমার মধ্যে লেপ্টে থাকা যাবতীয় কলুষতা-আবিলতাকে দূর করে ফেলো।

= ঘরের মেঝে আমাকে বলে, তোমার সমস্ত আশা-আকাঙ্খাকে সিজদায় ব্যক্ত করতে শেখ। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমার দু'আ-প্রার্থনা কখনো কিছুতেই ভুলে যাবেন না। হ্যাঁ সেটার বাস্তবায়নকে বিলম্বিত করতে পারেন)। মাটির মতো নিজেকে অন্যের জন্য বিলিয়ে দিতে শেখ।

জীবন জাগার গল্প: ৫৩৫

বিল-বদান্যতা

রাবিত ঘরে ফিরছিলো। রাস্তা তীব্র যানজট। একটা গাড়িতেও চড়ার উপায় নেই। এদিকে পেট খিদেয় চোঁ চোঁ করছে। অগত্যা বাধ্য হয়ে একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসলো। খাবারের অর্ডার দিলো।

খাবার খেয়ে বিল দিতে গিয়ে দেখে তার পকেটে মানিব্যাগটা নেই। এই পকেট সেই পকেট, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মিলল না।

তার মনে পড়লো মানিব্যাগটা আসলে অফিসেই ফেলে এসেছে। আসার আগে নিচের ড্রয়ারটা খোলার সময় মানিব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখেছিলো। আসার সময় আর খেয়াল ছিলো না। ভাগ্যিশ, পকেটে কিছু খুচরা টাকা ছিলো। সেগুলো দিয়ে হয়ত টেনেটুনে বাসায় ফেরার ভাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু খাবারের বিল?

রাবিত খুবই পেরেশান হয়ে গেলো। শেষে সিদ্ধান্ত নিল, ম্যানেজারকে গিয়ে তার অবস্থা খুলে বলবে। রাজি হলে হাতের দামি ঘড়িটা বন্ধক রাখবে।

পায়ে পায়ে গিয়ে ম্যানেজারকে বিষয়টা খুলে বলতে যাবে তার আগেই ম্যানেজার বলে উঠলেন,

-আপনার বিল তো দেয়া হয়ে গেছে।

-আমার বিল দেয়া হয়ে গেছে? কে দিলো? আমার সাথে তো কেউ ছিল না?

-আপনাকে পেরেশান হয়ে পকেট হাতড়াতে দেখে একজন খদ্দের আপনার অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি চুপিচুপি আমাকে বিলটা দিয়ে গেলেন।

-মানুষটা কোথায়? আমাকে একটু দেখিয়ে দিন তো!

-তাকে আর পাবো কোথায়? তিনি তো আপনার আগেই বের হয়ে গেছেন।

-এখন আমি এখন তার ঋণ কিভাবে পরিশোধ করবো? তাকে কোথায় পাবো বলতে পারেন?

-তাকে তো আমি চিনি না। তবে পরিশোধ করার একটা উপায় আপনাকে বাতলে দিতে পারি।

-কি উপায়?

-আপনিও খেয়াল রাখবেন, কখনো যদি দেখেন আপনার মতো অন্য কেউ এই অবস্থায় পড়েছে, তাহলে আপনিও তাকে এভাবে সহযোগিতা করবেন।

জীবন জাগার গল্প:৫৩৬

তিন শিষ্য

গুরুর পাঠশালার শিক্ষা শেষ। দীর্ঘ বারো বছর গুরুর কাছে ছিলো। আজ বিদায়ের পালা। এবার যাবে বিশ্ব পাঠশালায়। এবার উন্মুক্ত পাঠশালার ছাত্র হবে। যাবার বেলায় গুরু বারবার বলে দিয়েছেন,

–বাছারা! এতদিনকার শিক্ষাকে এক মুহূর্তও ভুলে যেও না। কিছুদিন পর আবার এসো। আমি যাচাই করে দেখবো, তোমরা কী শিখেছো।

তিন শিষ্য যে যার পথে চলে গেলো। নানা দেশে ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু শিখলো। অনেক কাজ করলো। বেশ কিছুদিন পর তিনজন ফিরে এলো। গুরু ততদিনে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। নড়াচড়ার শক্তি কমে গেছে। একটা খাটিয়াতে শুয়ে-বসে দিন কাটছে।

গুরু শিষ্যদেরকে কাছে ডেকে বসালেন। তাদের হাল-হাকীকত জনতে চাইলেন। প্রথম জন দম্ভভরে বললো,

–আমি এ কয় বছর লেখালেখিতে প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলাম। অসংখ্য কিতাবপত্র লিখেছি। চারদিকে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। লোকজন দেদারসে আমার বইগুলো কিনছে।

সব শুনে গুরু বললেন,

–তুমি তো দেখি চারদিক কাগজ দিয়ে ভর্তি করে ফেলেছ।

দ্বিতীয় জন বললো,

–আমি হিকমত-দর্শন অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। পাশাপাশি জন সাধারণ্যে ওয়াজ-নসীহতও শুরু করেছিলাম। এখন আমি অসংখ্য মসজিদে নিয়মিত বয়ানকারী। আর আমার ওয়াজের প্রসিদ্ধি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

গুরু বললেন,

–তুমি তো দেখি চারদিক কথায় ভর্তি করে ফেলেছো।

তৃতীয় জন বললো,

–আমি খুব বেশি পড়াশুনা করতে পারিনি। একটা কাজই শুধু আমি করার চেষ্টা করেছি, কেউ অসুস্থ হলে সাধ্যমত সেবার চেষ্টা করেছি। আশেপাশে কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখলে সাহায্যের চেষ্টা করেছি। ধনী গরীবের মাঝে বাছবিচার করিনি। আমি এসব কাজের জন্য কোনও প্রতিদান চাইনি। জীবনটা অন্যের সেবাতেই কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। কয়দিন আগে শুনলাম, আপনি অসুস্থ। তাই আপনার সেবার জন্য ছুটে এসেছি। এই নিন, আপনার জন্য এই আরামদায়ক বালিশটা তৈরি করেছি। আমি আরাম করে হেলান দিয়ে বসতে পারবেন।

গুরু মুচকি হেসে বললেন,

-তুমিই আল্লাহকে পাওয়ার পথ ধরেছ। হয়তো পেয়েও গেছ।

জীবন জাগার গল্প: ৫৩৭

রকমারি

এক.

এক বন্দী বিচারককে বললো,

–কোনও অপরাধ ছাড়াই আমাকে দুই দিন যাবত কেন বন্দী করে রাখা হলো?

বিচারক রেগে গিয়ে বললো,

–এই, এর মেয়াদ দুই মাস করে দাও।

–কেন?

–এর মেয়াদ দুই বছর করে দাও।

কারাপ্রহরী বন্দী লোকটির কানে কানে বললো:

- আর কথা বাড়িও না। কথা বললেই শাস্তির মেয়াদ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এখন থামো। পরে বিচারকের মেজায ঠাণ্ডা হলে বলা যাবে।

(এটা জুলুম)

দুই.

বদি মিয়া দীর্ঘ দিন ধরে মুমূর্ষ অবস্থায় বিছানায় শোয়া। নানা বাছবিচার করে খাওয়া-দাওয়া করেছে। ডাক্তার বলেছেন ক্যান্সার হয়েছে। আয়ু আর বেশিদিন নেই। বদি মিয়া মৃত্যুর ভয়ে ঘর ছেড়ে বেরুনো ছেড়ে দিল। সারা দিনমান বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিতে লাগলো। একদিন ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার সময় বাসচাপায় মারা গেল।

(এটা তাকদীর)

তিন.

বাবা প্রচণ্ড বদমেজাজী। ছেলেমেয়েদেরকে মারে মারেই তো তাদের মায়ের গায়েও হাত তুলছে। সারাক্ষণই পরিবারের সবাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলছে। কাউকে ন্যূনতম সম্মানও দেখাচ্ছে না।

এমনকি পুরো সংসার ছেড়ে নিজেই একদিন উধাও হয়ে গেল। কোনও প্রকারের যোগাযোগ রাখলো না। বহু বছর পর বৃদ্ধ বয়েসে, অক্ষম অবস্থায় এসে সন্তানদেরকে নসীহত করছে,

–ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা তথা তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচার করো।

(এটা মন্দ প্রতিপালন)

চার.

তিনজন ফকীর মিলে তিনটা আপেল কিনলো। রাতের বেলা ঝুপড়িতে এসে প্রথম জন তার ভাগের আপেলটা কাটলো। দেখা গেল পচা। ফেলে দিল।

দ্বিতীয় জন তার ভাগেরটা কাটলো। এটাও পচা। না খেয়ে ফেলে দিল।

তৃতীয় জন প্রথমে চেরাগটা নিভিয়ে দিল। তারপর তার ভাগের আপেলটা কেটে চোখমুখ বন্ধ করে খেয়ে ফেলল।

(এটা বেঁচে থাকার জন্য আশেপাশের কষ্টকে ভুলে থাকা)

পাঁচ.

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। এক লোক দৌড়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পায়ের একপাটি জুতা পড়ে গেলো। লোকটা আরেক পাটি জুতো আগেরটার দিকে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বললো,

-সম্ভবত কোনও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির কাজে লাগবে।

(এটা মহত্ব)

সাত.

বিয়ের পর দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও দুজনে বনিবনা হচ্ছে না। পাড়া-প্রতিবেশী প্রশ্ন করলো:

—কারণ কি?

—আমি আমার ঘরের (নিজের স্ত্রীর) কথা পরের কাছে কিভাবে বলি?

কিছুদিন পর লোকটার সাথে তার স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। পাড়া-প্রতিবেশী আবার প্রশ্ন করলো:

—বউয়ের সাথে মিল না হওয়ার কারণ কি?

—আমি একজন বেগানা নারী সম্পর্কে কিভাবে মন্তব্য করি?

(এটাই পৌরুষত্ব)

জীবন জাগার গল্প: ৫৩৮

টেলিভিশন

এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ছাত্রদেরকে রচনা লিখতে বলা হলো। তুমি আল্লাহর কাছে কী চাও? গুছিয়ে লিখ। তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের রচনা দেখার ভার পড়লো জাহানারা ম্যাডামের ওপর। ম্যাডাম বাড়িতে এসে ছাত্রদের রচনার

খাতা খুলে বসলেন। পড়তে পড়তে একটা খাতায় তার চোখ আটকে গেলো। খাতাটার রচনা পড়ে তার দু'চোখ ফেটে অশ্রু বইতে লাগলো। এমন সময় স্বামী অফিস থেকে ফিরলেন। স্ত্রীকে একটা খাতা হাতে বসে বসে কাঁদতে দেখে অবাক হলেন। জানতে চাইলেন,

-কাঁদছো কেন?

-এই খাতার রচনাটা পড়ে কাঁদছি।

-দেখি খাতাটা!

স্বামী খাতাটা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

-আল্লাহ! আমি আজ আপনার কাছে একটা বিশেষ উপহার চাইব। আপনি আমাকে একটা টেলিভিশন করে দিন। আমি চাই আমার স্থান হবে টেলিভিশনের জায়গায়। আমি একটা টেলিভিশন হিসেবে জীবন যাপন করতে চাই। আমি আমাদের বাসায় টেলিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানটা দখল করতে চাই। সবাই একনাগাড়ে কোনও প্রশ্ন ছাড়াই আমার কথা শুনবে। আমার চারপাশে বসবে। আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। আমিই হবো বাসার সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। আব্বু অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে কারো সাথে কোনও কথা না বলে, সোজা আমার সামনে বসে যাবেন। আম্মুও যতক্ষণ বাসায় থাকবেন প্রায় সারাক্ষণই আমার অনুষ্ঠানগুলো দেখবেন। আমার ভাইবোনেরাও আমার চারপাশে ঘোরাঘুরি করবে। আমার কাছাকাছি বসার জন্য ঝগড়া-অভিমান করবে।

আমি পুলকিত হয়ে দেখবো, আমার পরিবার সবকিছু ছেড়ে, সময় কাটানোর জন্য আমার কাছে এসেছে।

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে যেভাবেই হোক একটা টিভি বানিয়ে দিন। যাতে আমি সবাইকে সুখী করতে পারি। সবাইকে বিনোদিত করতে পারি।

ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বেশি কিছু তো চাইছি না। আপনি আমার এই ছোট্ট আবদারটুকু রাখুন। আমার একা একা থাকতে আর ভালো লাগে না।

স্বামী লেখাটা পড়েই আর্তনাদ করে উঠলেন,

-আহ! ছেলেটা খুবই নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে। ছেলেটার বাবা-মাও কেমন। ছেলেটাকে একটু সময় দিলে কি হয়। ইশ! ছেলেটার জন্য আমার খারাপ লাগছে।

জাহানারা ম্যাডাম ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললেন:

-ওগো! কী দুর্ভাগ্য! তুমি কি নিজের ছেলের হাতের লেখাও চিনতে পারছো না?

জীবন জাগার গল্প: ৫৩৯

ভালোবাসা

এক.

সুহাইল একটা ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করে। সংসারে এক মা ছাড়া আর কেউ নেই। মায়ের দেখাশুনা করার সুবিধার্থে সে অফিসের কাছেই ছোট্ট একটা বাসা ভাড়া নিয়েছে। অন্য এলাকার তুলনায় ভাড়ার পরিমাণটা অনেক বেশি। গলাকাটা বলা চলে। কিন্তু মায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে টাকার দিকে তাকায়নি।

প্রতিদিন দুপুরে সুহাইল বাসায় এসেই খাবার খেয়ে যায়। আজ অফিসের কাজে আটকা পড়ে যাওয়াতে দুপুরে খাবার খেতে বাসায় যেতে পারলো না। আম্মু ফোন করলেন,

-খোকা! ভাত খাবি না? আমি তো তোর জন্য ভাত বেড়ে বসে আছি।

-তুমি খেয়ে ফেলো। আমি আজ আসতে পারবো না।

–তোকে ছাড়া একা একা কিভাবে ভাত খাই? তুই বিকেলে এলে এক সাথে খাব।

(কী জানি এটাই হয়তো ভালোবাসা)

দুই.

আব্বু চাকুরি করেন ঢাকায়। একটা হোটেলে। মাস শেষে যৎসামান্য যা বেতন পান, নিজের কাছে হাজারখানেক টাকা রেখে, বাকি পুরো টাকাটাই পাঠিয়ে বলেন,

-আরো লাগলে বলিস। চেষ্টা চরিত্র করে পাঠিয়ে দেবো। আমার আর খরচ কি, থাকা-খাওয়া সব তো হোটেলেই করি।

অথচ আমরা জানি, আব্বুর ওষুধ খরচেই শপাঁচেক টাকা লেগে যায়। সিএনজি এক্সিডেন্টের পর নিয়মিত ডাক্তারের কাছেও যেতে হয়। সেটার ফিও আছে। তারপরও আব্বু কোনও কোনও মাসে ওষুধ খরচটাও বাঁচিয়ে পরের মাসে পাঁচশ টাকা বেশি পাঠিয়ে বলেন,

-এ মাসে ওষুধের প্রয়োজন হয়নি।

(কী জানি, আব্বুর এই মিথ্যাটাই হয়তো ভালোবাসা)

তিন.

বৃহস্পতিবারে হোস্টেল থেকে বাড়ি গেলেই দাদু কাছে টেনে নেন। ধবধবে শাদা থান কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে দেন। পুরো সপ্তাহ কী খেয়েছি, কী করেছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন। আর লম্বা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

সাথে সাথে বড়শিটা নিয়ে পুকুর পাড়ে চলে যান। কলের গোড়া থেকে একটা কেঁচো ধরে, বড়শিতে গেঁথে মাছ ধরতে বসেন। এতিম নাতিটার পাতে যদি একটা মাছ দিতে পারেন, ভালো লাগবে।

শনিবারে ফেরার সময়, দাদু সাথে আসতে আসতে পুব পুকুর পার হয়ে কাঁচারি ঘরটার কিনারা পর্যন্ত আসেন। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে, টলমলো চোখে বলেন,

-আজকে না গেলে হয় না?

(কী জানি এটাকেই হয়তো ভালোবাসা বলে)

চার.

বুবুর বিয়ে হয়েছে আজ এক বছর হতে চলল। শ্বশুর বাড়িতে চলে গেলেন। বুবু বারবার খবর পাঠচ্ছেন, তার কাছে গিয়ে ক'টা দিন থেকে আসতে। শিহাব নানা ছুতোয় পাশ কাটিয়ে গেছে। এবার দুলাভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুলাভাই সাত ক্রোশ রাস্তা সাইকেল চালিয়ে এসেছেন। আপু বলে দিয়েছেন, তাকে না নিয়ে ফিরে না যেতে।

পৌছামাত্র আপু জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, কেন এলি? আমার তো কেউ নেই। আমার তো কোনও ভাই নেই। তোরা তো আমাকে বনবাসে পাঠিয়েই খুশি।

ফিরে আসার দিন, আপুর আকাশ ফাটা কান্না দেখে মনে হয়,

(কী জানি, এটাকেই হয়তো ভালোবাসা বলে)

পাঁচ.

সামান্য বেতনের চাকুরি। কোনও রকমে টেনেটুনে সংসার চলে যায়। ঈদে-চাঁদে নামমাত্র বোনাস। তারপরও শরীফ বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা হাওলাত করল। ছোট ভাইবোনের জন্য নতুন জামা কিনে নিয়ে গেল। নতুন জামা পেয়ে দু'জনের সে কী খুশী। কী লাফালাফি!

(কী জানি, এটাই হয়তা ভালোবাসা)

জীবন জাগার গল্প: ৫৪০

সন্ত্রাসের সংজ্ঞা

এক জার্মান প্রফেসরকে প্রশ্ন করা হলো:

-এই যে ক্রমবর্ধমান মুসলিম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইউরোপের বর্তমানে কী করণীয়?

-মুসলিম সন্ত্রাস বলে কিছু নেই। সন্ত্রাসী বলতে হলে ইউরোপকেই বলতে হবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ তো সব ইউরোপই করেছে।

= প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কে শুরু করেছে?

-ইউরোপ। মুসলমানরা নয়।

= কারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিলো?

-ইউরোপ। মুসলমানরা নয়।

= অস্ট্রেলিয়ার প্রায় বিশ মিলিয়ন আদিবাসীকে কে হত্যা করেছে?

- ইউরোপ। মুসলমানরা নয়।

= হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে কে আণবিক বোমা ফেলেছিলো?

- ইউরোপ। মুসলমানরা নয়।

= উত্তর আমেরিকার প্রায় একশ মিলিয়ন রেড ইন্ডিয়ানদের কারা হত্যা করেছিলো?

- ইউরোপ। মুসলমানরা নয়।

= দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন রেড ইন্ডিয়ানদের কারা হত্যা করেছিলো?

- ইউরোপ। মুসলমানরা নয়।

= আফ্রিকার প্রায় ১৮০ মিলিয়ন অধিবাসীকে কারা দাস বানিয়েছিলো, যেসব দাসের ৮৮% ভাগই আটলান্টিক মহাসাগরে মারা গিয়েছিলো?

- ইউরোপ। মুসলমানরা নয়।

প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা কী? অমুসলিমরা করলে সেটা 'অপরাধ'। আর মুসলমানরা করলে সেটা সন্ত্রাস এ কেমন কথা? আমাদের আলোচনা/ সাক্ষাৎকার শুরু করার আগে বিষয়বস্তুটা পরিষ্কার করে নেয়াটা জরুরি।

জীবন জাগার গল্প: ৫৪১

পিতার সংজ্ঞা

শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমাপনী পরীক্ষা চলছে। প্রশ্নমালায় একটা প্রশ্ন ছিলো:

= পিতা কে?

সবাই যে যার মত উত্তর দিয়েছে। একজনের উত্তরটা ছিলো সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি লিখেছেন,

পিতা (আগে)

= তার জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটতে, তোমার ছোট ছোট পা তার বড় বড় জুতো থেকে পিছলে বের হয়ে যেতো।

= তার চশমা চোখে দিয়ে নিজেকে বড় মনে করতে।

= তার কোট গায়ে দিয়ে নিজেকে গুরু-গম্ভীর, রাশভারী একজন পুরুষ মনে করতে।

= বাবার সাইকেলটা বাড়ির উঠানে চালাতে চালাতে ভাবতে, আমি নিজেই বাবা!

= মনে কোনও কথা জেগে উঠলেই দৌড়ে গিয়ে বাবাকে না বলতে পারলে শান্তি পেতে না। অথচ বাবা তখন কাছারিঘরে বন্ধুর সাথে কথা বলছেন বা চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে জরুরি বৈঠকে আছেন অথবা স্কুলের খাতা কাটা নিয়ে ব্যস্ত। এত কিছুর মাঝেও তিনি কাজ থামিয়ে, একটুও বিরক্ত না হয়ে কথা শুনতেন।

= বাবা ক্লান্ত-শ্রান্ত-বিরক্ত-ক্ষুধার্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। ঘরে এসে অন্যদিনের মতো তোমাকে ডাকতে ভুলে গেলেন। তুমি গিয়ে গাল ফুলিয়ে বললে,

-আব্বু! তুমি তো আজ আমাকে ডাক দাওনি?

-ওহহো! একদম ভুলে গিয়েছি।

এরপর আব্বু হাসিমুখে আবার দরজা খুলে বাইরে গেলেন। এবার তোমাকে জোরে ডাকতে ডাকতে ঘরে প্রবেশ করলেন।

পিতা (আজ)

= তুমি এখন আর বাবার জুতা পায়ে দাও না। কারণ সেটার ডিজাইন অনেক আগের।

= তার জামা এখন আর তোমার ভাল লাগে না। ওসব জামা এখন কেউ পরে না।

= তার চশমা তোমার ভাল লাগে না। তোমার চোখে এখন কন্টাক্ট লেন্স।

= তার সাইকেল তোমার কাছে ভাল লাগে না। তোমার চোখে এখন বিএমডব্লিউর নেশা।

= বাবার কথাবার্তাও এখন আর পছন্দ হয় না। বড্ড সেকেলে কথাবার্তা আরা দেখা হলেই খালি উপদেশ।

= তার কাশির আওয়াজ তোমার বিরক্তি উদ্রেক করে। বন্ধুদের সামনে বাবা এসে পড়লে তোমার কপাল কুঁচকে ওঠে।

= দেরি করে ঘরে ফিরছো দেখে তোমাকে ফোন করে, তখন তুমি বিরক্ত হও। ফোন রিসিভ করো না, বারবার কল করতে থাকলে, তুমি কলটা রিসিভ করে কোনও সম্বোধন ছাড়াই ধমক দিয়ে ফোনটা কেটে দাও।

= কোনও অপরাধ করলে বাবা তোমাকে সংশোধনমূলক কথা বলতে এলে তুমি তাকে উল্টো দু'কথা শুনিয়ে দাও। তিনি চুপ হয়ে যান। ভয়ে নয়, তোমার আচরণে আঘাত পেয়ে।

= আগে তার যৌবনে তিনি তোমাকে কাঁধে চড়িয়ে হাঁটতেন। আর এখন তো তুমি তার চেয়ে অনেক লম্বা।

= আগে তুমি ঠিক মতো কথা বলতে পারতে না, মুখে আটকে যেত। এখন তোমাকে বাধা দেয়ার কেউ নেই, কারণ বাবা তো দাঁত না থাকায় ঠিক মতো কথা বলতে পারেন না।

= যতই বড় হও না কেন, তিনি তোমার জন্মদাতা। তিনি তোমার শত আবদার রক্ষা করেছেন। তোমার অনেক নির্বুদ্ধিতা প্রশয়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন। অজ্ঞতাকে আদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন।

উত্তরের শেষে এসে লেখা:

= আমার বাবার অসুস্থতায় ও বার্ধক্যে তাকে সন্তানের মতো লালন করবো। কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে, তোমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব কে?

আমি নির্দ্বিধায় বলবো,

-আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব তিনি, যিনি আমার জন্যে নয় মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। বিপুল আনন্দে আমার পৃথিবীতে আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে আমাকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনিই চিরদিন আমার হৃদয়ের রাজা হয়ে থাকবেন। ক্ষমা প্রার্থনা করছি সমস্ত পুরুষদের কাছে।

= আমার বাবার মতো আর কেউ নেই। হতে পারে না।

জীবন জাগার গল্প: ৫৪২

পিতা পুত্রকে

বাবা ছেলেকে বলছেন,

এক: তোমার চলার পথে পিঁপড়া দেখো সেটাকে মাড়িয়ে যেয়ো না। তোমার এই আচরণ দ্বারা তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। আশা করি তিনি তোমাকে দয়া করবেন যেমন তুমি তার মাখলূকের প্রতি দয়া করেছো।

এটাও মনে রাখবে, পিঁপড়া কিন্তু সবসময় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে, তুমি কেন শুধু শুধু সেটাকে হত্যা করে তাসবীহ পাঠ বন্ধ করে দিবে?

দুই: যদি দেখ তোমার চলার পথে কোনও চড়ুই পুকুর থেকে পানি খাচ্ছে, তাহলে পানি খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তুমি এগিয়ে গেলে চড়ুইটা পানি না খেয়েই ভয় পেয়ে উড়ে যাবে।

তোমার এই আচরণের বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। আশা করি আল্লাহও তোমাকে ভয়মুক্ত রাখবেন, যেদিন প্রাণ কণ্ঠনালীতে এসে পৌঁছবে।

তিন: হাঁটার সময় রাস্তার মাঝে কোনও বেড়ালছানা দেখলে, সেটাকে রাস্তার অপর পাশে রেখে আসবে। হয়তো সেটা ভয় পেয়ে রাস্তা পার হতে পারছিল না।

তোমার এই আচরণের বিনিময়ে তুমি সন্তুষ্টি কামনা করবে। আশা করি তিনি এর প্রতিদানে তোমাকে খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা করবেন।

চার: তুমি উচ্ছিষ্ট খাবার ডাস্টবিনে ফেলার সময় নিয়ত রাখবে যে, খাবারটা আমি এখানে ফেলে দিচ্ছি না বরং বেড়াল কুকুর কাক বা অন্য কোনও প্রাণী খাওয়ার জন্য রাখছি।

তুমি এই কাজের বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। আশা করি তিনি তোমাকে কল্পনাতীত স্থান থেকে রিযিক দান করবেন।

পাঁচ: যদি খুব বেশি গরম পড়ে আর অনাবৃষ্টিতে খালবিল শুকিয়ে যায়, তখন তুমি উঠোনে বা ঘরের ছাদে বা জানালায় এক বাটি পানি রেখে দিবে। পাখিরা তাহলে সেখান থেকে পানি খেতে পারবে।

তুমি এ কাজের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। আশা করি তিনি তোমার জন্য মহা পিপাসার দিনে পানি পানের ব্যবস্থা করবেন।

জীবন জাগার গল্প: ৫৪৩

তারা ও আমরা

এক: উন্নত বিশ্বের একজন যুবক যখন কম্পিউটার গেমস তৈরীতে ব্যস্ত থাকে তখন তৃতীয় বিশ্বের একজন যুবক কম্পিউটার গেমস খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

দুই: উন্নতবিশ্বের একজন যুবক গুগলে সার্চ দিয়ে নতুন কী আবিষ্কার হলো সেটা খোঁজে আর তৃতীয় বিশ্বের একজন যুবক গুগলে বসেই অশ্লীল কিছু খোঁজে।

তিন: উন্নত বিশ্বের লোকেরা মোবাইল ব্যবহার করে তাদের কাজকর্ম সারার জন্য, ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য। তৃতীয় বিশ্বের লোকেরা মোবাইল ব্যবহার করে গান শোনার জন্য, ভিডিও দেখার জন্য, অপ্রয়োজনীয় আলাপ করার জন্য।

চার: মুসলিম বিশ্বের একজন গবেষক ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে তার গবেষণার সহায়ক প্রবন্ধ-নিবন্ধ বের করে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সেই প্রবন্ধ আরো একশ বছর আগেই কোনও ইহুদি-খ্রিস্টান লিখে বসে আছে।

পাঁচ: উন্নত বিশ্বের মানুষজন যেখানে চলার পথে যানবাহনে বসে বসে বইপত্র পড়ে। তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে দেখা যায় সেসময় অন্যযাত্রীদের সাথে ঝগড়া করে, ধাক্কাধাক্কি করে, বেগানা নারীদের দিকে তাকিয়ে থাকতে।

ছয়: অমুসলিমরা যখন ইসলাম নিয়ে পড়ালেখা করতে ব্যস্ত সে সময় মুসলমানদেরকে দেখা যায় হলিউড-বিশ্বকাপ-রিয়েল মাদ্রিদ নিয়ে ব্যস্ত।

সাত: ইউরোপ যখন তাদের মূলধন ব্যয় করছে অস্ত্র তৈরীতে, আরববিশ্ব তাদের তেলবেচা টাকা ব্যয় করছে সেই অস্ত্র কিনতে।

জীবন জাগার গল্প: ৫৪৪

মুনাযারা

উপনিবেশিক আমল। খৃস্টান ধর্মজাযকদের স্বর্ণযুগ। এক মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে, খৃস্টান যাজকরা গিয়ে বোঝাতে লাগলো,

-খ্রিস্ট ধর্মই সত্য ধর্ম। যিশু খ্রিস্টই সর্বশেষ নবী। তিনি আল্লাহর পুত্র। ঘটনাক্রমে সেখানে একজন বড় আলিমে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি এগিয়ে গেলেন। যাজকরা আলিমকে দেখে তাকে ঘিরে ধরলো। আলিম তাদেরকে বললেন,

-আপনারা কেন এসেছেন?

-যিশুর বাণী প্রচার করতে এসেছি।

-ঠিক আছে, তার আগে আমরা দুই পক্ষ বসে একটা সিদ্ধান্তে আসি, তারপরে না হয় আপনার প্রচারকার্য চালাবেন।

একজন যাজক তেড়ে উঠে বললেন:

-মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর খুবই প্রিয় ছিলেন, এটা কি ঠিক?

-হাঁ, অবশ্যই ঠিক।

-মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাতি হুসাইনকে খুবই ভালোবাসতেন এটা কি ঠিক?

-ঠিক।

পাদ্রী একগাল হেসে বললেন:

–আপনারা বলেন, জান্নাতে কেউ আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে, সঙ্গে সঙ্গে তা কবুল হয়ে যায়, এটা কি ঠিক?

–ঠিক।

–তাহলে বলুন, হুসাইনকে যখন ইয়াযিদের বাহিনী শহীদ করে দিচ্ছিলো, তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় ছিলেন?

–জান্নাতে।

–মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তার আদরের নাতির কথা জানতেন?

–জানতেন।

–তাহলে কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে কি তার নাতির জন্য দু'আ করেননি?

–হ্যাঁ করেছিলেন।

–যদি দু'আ করে থাকেন, সে দু'আ কবুল হলো না কেন?

–তখন আল্লাহ তা'আলা রাসুলের দু'আ কবুল করতে না পেরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন।

পাদ্রী চোখ বড় বড় করে বলে উঠলো,

–একি বললেন মাওলানা! আল্লাহ পারেন না এমন কোনও কিছু আছে? আর আল্লাহ কি কাঁদেন?

–আল্লাহ তখন রাসূলকে বললেন, দেখুন! আপনি আমার হাবীব। আর হুসাইন হলো আপনার আদরের নাতি। আমার ছেলে ঈসাকে যখন শত্রুরা শূলীতে চড়িয়ে হত্যা (?) করলো তখন আমি তাকে উদ্ধার করতে পারিনি। এখন আপনার নাতিকে কিভাবে আমি উদ্ধার করি বলুন?

পাদ্রী দুচোখ ছানাবড়া করে বললো,

–আপনি তো মশাই বিপজ্জনক লোক দেখছি।

জীবন জাগার গল্প : ৫৪৫

লিফট-আরোহিনী

আমেরিকা। নিউইয়র্কের এক বহুতল বিল্ডিং। লিফট ছাড়া ওঠানামা করা এক প্রকার অসম্ভবই বলতে গেলে।

লিফটে উঠলো এক মেয়ে। আর কেউ নেই। বোতাম টিপতে যাবে এমন সময় হুড়মুড় করে এক কালো যুবক এসে লিফটে উঠলো।

মেয়েটা ভয় পেয়ে গেলো। এই ঘুসঘুসে কালো যুবক তাকে একা পেয়ে আবার তার সাথে কেমন আচরণ করে?

আমেরিকায় অনেক অপরাধ এই লিফটেই সংগঠিত হয়।

লিফট চলতে শুরু করলো। মেয়েটা ভয়ে ভয়ে আছে। তটস্থ হয়ে সতর্ক নজর রাখছে। কিছুক্ষণ পর মেয়েটা অবাক হয়ে দেখলো, ছেলেটা তাকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে পিঠ দিয়ে।

এদিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

এবার তার উল্টো প্রতিক্রিয়া হলো। কি রে, ছেলেটা তাকাচ্ছে না কেন? আমি কি দেখতে এতটাই অসুন্দর? কুৎসিত?

লিফট গন্তব্যে পৌছলো। দুজনেই নামলো। ছেলেটা বের হয়েই হনহন করে হেঁটে চলে যাচ্ছিলো। মেয়েটা পেছন পেছন গিয়ে ডাকলো:

–এই যে শুনুন (এক্সকিউজ মি)! একটা প্রশ্ন করতে পারি?

–অবশ্যই।

–আমি কি দেখতে সুন্দর নই?

ছেলেটি মাথা নিচু করে আছে। সে অবস্থাতেই জবাব দিলো:

–জি সুন্দর।

–তাহলে লিফটে আমার দিকে একবারও তাকালেন না কেন?

–আমার ধর্ম (ইসলাম) আমাকে বেগানা (অপরিচিত) মেয়েদের প্রতি তাকাতে নিষেধ করে।

–কেন?

–এটা ছেলের জন্যও নিরাপদ, মেয়ের জন্যও সুরক্ষা।

–আপনার ধর্ম আর কী কী বলে?

–অনেক কিছুই বলে। বিস্তারিত জানতে চাইলে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

ছেলেটা একটা ঠিকানা দিয়ে বিদায় নিলো।

জীবন জাগার গল্প : ৫৪৬

অমূল্য শিক্ষা

ব্রাসেলস। বেলজিয়ামের রাজধানী। ফেইথ (বিশ্বাস), একটা সুপার শপের নাম। শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। মালিকের নাম হিশাম গুইয়া। মরোক্কান প্রবাসী। দোকানে সবসময় ভীড় লেগেই থাকে। খদ্দেরের আনাগোনায় সরগরম। চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকে।

তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো,

–আপনার দোকানে কেন খদ্দেররা সব ভীড় জমায়? অন্য দোকান থেকে আপনার সুপার শপের আলাদা বৈশিষ্ট্যা কী? আপনার এই সফলতার রহস্যই বা কী?

–আমি দোকানের রহস্য বলার আগে, একটু পেছনের ইতিহাস টানতে চাই।

–জি, তাহলে তো ভালোই হয়।

–আমি সেবার নিউইয়র্ক গেলাম। ওখানে আমাদের একটা চেইন শপ খোলা যায় কিনা, সেটা যাচাই করে দেখতে। তখনো আমাদের এই 'ফেইথ' এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কোনও রকমে একটা ট্যাক্সিক্যাব ভাড়া নিয়েই গন্তব্যে চলে যাবো এই ছিলো অভিপ্রায়।

শীতে হি হি করতে করতে ক্যাব খুঁজছিলাম। একটা ক্যাব এসে পাশে দাঁড়ালো। চালক দ্রুত নেমে এসে খুবই বিনয়ের সাথে পেছনের দরজা খুলে দিল। আমি ভেতরে বসার পর যত্ন করে সীটবেল্ট বেঁধে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করে তার আসনে গিয়ে বসলো। আমার দিকে ফিরে বললো,

–স্যার! আপনার সামনে পকেটে ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল রাখা আছে, এ সপ্তাহের টাইম আর এ মাসের রিডার্স ডাইজেস্ট আছে। ইচ্ছা করলে পড়তে পারেন। পড়তে ইচ্ছা না করলে এই নিন বাইনোকুলার। এটা দিয়ে আপনি কুয়াশার মধ্যেও অনেকদূরের দৃশ্য সুন্দরভাব দেখতে পারবেন। আর আপনার বামের পকেটটাতে আছে ছোট্ট একটা ক্যামেরা। ওটা দিয়ে আপনি যত ইচ্ছা ছবি তুলতে পারেন। আমি রাতে আপনার ই-মেইলে ছবিগুলো পাঠিয়ে দেব। স্যার কোথায় যাবেন একটু বললে গাড়িটা স্টার্ট দিতে পারি।

আমি গন্তব্যের নাম বললাম। তার নাম সে বললো, পেটি পার্কার। গাড়ি চলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর সে বললো,

–স্যার! আপনি কি কিছু শুনতে চান?

–কী শুনবো?

–এই ধরেন মাইকেল জ্যাকসন বা ব্রিটনি?

–না না, আমি গান শুনি না।

–স্যার কি মুসলিম?

–জি।

–তাহলে কুরআন তিলাওয়াত দেই?

–হ্যাঁ দাও।

তার কার্যকলাপ দেখে আমার দুই চোখ কপালে উঠে যাচ্ছিলো। শেষে আর থাকতে না পেরে তাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম:

–তুমি একটা ভাড়া গাড়ির মধ্যে এতকিছুর আয়োজন কেন রেখেছ? নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনও গল্প আছে?

–জি স্যার।

–তোমার গল্পটা শোনার জন্য আমি রীতিমতো মুখিয়ে আছি। বলো।

–আমি পড়াশুনা শেষ করে একটা কর্পোরেট অফিসে চাকুরি নিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানকার ধরাবাঁধা টাইমটেবল আমার ভালো লাগতো না। চাকুরিটা ভালো হলেও আমার মনমতো ছিলো না। ছেলেবেলা থেকেই আমার গাড়ি চালাতে ভালো লাগে। একদিন ধুম করে চাকুরিটা ছেড়ে দিলাম। বেটি মানে আমার স্ত্রী অনেক নিষেধ করেছিলো। কিন্তু আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলাম।

তিনদিন ঘরে বসে চিন্তা-ভাবনা করে কাটিয়ে দিলাম। চতুর্থ দিন বের হয়ে একটা ক্যাব কোম্পানীর অফিসে যোগাযোগ করলাম। আমাকে তাদের পছন্দ

হলো। সেদিনই তাদের একটা ক্যাব চালানো শুরু করে দিলাম। কিছুদিন পর ধারদেনা করে একটা পুরোনো ট্যাক্সিক্যাব কিনে ফেললাম। জীবনটাকে নতুন করে শুরু করবো। এতদিন ভাড়া ট্যাক্সিক্যাব চালানোর অভিজ্ঞতার আলোকে, চিন্তাভাবনা করে কয়েকটা বিষয় ঠিক করে নিলাম,

এক: আমি শত চেষ্টা করলেও একজন রকেট-চালক হতে পারবো না। কিন্তু গাড়িটা আমি ভালোই চালাতে পারি। গাড়ি চালানোর পেশাটাই আমার মনের মতো পেশা। এটাতে লেগে থাকলেই আমি মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করতে উৎসাহ পাবো।

দুই: যেটা আমার কাছে ভালো, সেটা অন্যের কাছে ভালো নাও হতে পারে। আমি চেষ্টা করবো অন্যের ভালোলাগাটাকে প্রাধান্য দিতে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা আমি বের করেছি, তা হলো:

তিন: আমি প্যাসেঞ্জারের কাছে একজন ভালো চালক হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে, আমাকে তাদের চাহিদাগুলো পূরণ করতে হবে।

এই তিন মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই ক্যাব চালানো শুরু করলাম। ভালোই চলছিলো। একদিন আমার মনে হলো,

-আমার মতো ভালো সার্ভিস দেয়া চালক তো আরো আছে। তাদের সাথে তো আমার কোনও পার্থক্য নেই। তাহলে কর্পোরেট অফিস ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসে কী লাভ হলো। আমাকে তো অন্য আরো দশজনের চেয়ে বেশি অগ্রসর হতে হবে।

আমাকে বাজারের সেরা সার্ভিসদাতা হতে হবে। প্যাসেঞ্জারের চাহিদা পূরণ করে আমি একজন ভালো চালক হতে পেরেছি। কিন্তু আমি হতে চাই সেরা চালক।

আমাকে সেরা চালক হতে হলে, প্যাসেঞ্জারকে চাহিদার বাইরেও কিছু দিতে হবে। তাদের প্রত্যাশার সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। তারা গড়পড়তা অন্যদের কাছ থেকে যে সেবা পেতে অভ্যস্ত সেটাকে অতিক্রম করে বাড়তি কিছু দিতে হবে।

জীবন জাগার গল্প : ৫৪৭

মহীরূহ

বাড়ির পেছনেই একটা বিরাট আমগাছ। প্রতিবছরই অনেক আম ধরে গাছটাতে। জুনাইদ সেই শিশুকাল থেকেই গাছটা দেখে আসছে। গাছটা তার খেলার সাথী। আগে গাছের গোড়ায় বসেই খেলতো, এখন একটু বড় হওয়ার পর, গাছে চড়তেও শিখেছে জুনাইদ। গাছটাকে সে একপ্রকার ভালোই বেসে ফেলেছে। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই একবার গাছটাকে দেখে যায়।

সময়ের বিবর্তনে জুনাইদ বড় হলো। এখন আর গাছের সাথে খেলা হয় না। একদিন কী মনে করে জুনাইদ গাছটার কাছে এল। আমগাছ ভীষণ খুশি হয়ে বললো,

–আসো, আমার সাথে একটু খেলা করো। আমার খুব খেলতে ইচ্ছে করছে।

–আমি কি এখন আর আগের মতো ছোট আছি? আমার এখন অন্য রকমের খেলনা দরকার। কিন্তু টাকার জন্য কিনতে পারছি না।

–কেমন খেলনা?

–আমি একটা সাইকেল কিনতে চাই।

–তাহলে এক কাজ করো, এবার তো বেশ ভালো আম ধরেছে। এগুলো বিক্রি করলেই তোমার সাইকেল কেনার টাকা হয়ে যাবে আশা করি।

জুনাইদ প্রস্তাবটা শুনে দারুণ উত্তেজিত হল। আর দেরী না করে গাছের সব আম পেড়ে নিয়ে গেল। আবার অনেক দিন জুনাইদের দেখা নেই। আমগাছটা বিষণ্ন হয়ে দিন কাটাতে লাগলো।

জুনাইদ আরো বড় হলো। এখন তার বিয়ের কথাবার্তা শুরু হয়েছে। টাকা পয়সার চিন্তায় মাথা খারাপ। নিরালায় বসে চিন্তা করার জন্য আমগাছটার ছায়ায় এসে বসলো। গাছটা তাকে দেখেই খুশি হয়ে গেলো। উৎফুল্লস্বরে বললো,

–এসো বন্ধু! খেলা করি।

–আরে রাখো, তোমার খেলা। আমি মরছি আমার জ্বালায়।

–কী হয়েছে?

–আমাদের ঘরটা তো দেখতেই পাচ্ছ, ভেঙেচুরে গেছে। মেরামত করা দরকার। কিন্তু টাকার যোগাড় হচ্ছে না। তুমি কোনও উপায় বাতলাতে পারো?

–এটা নিয়ে তুমি ভাবছো কেন? আমার তো অনেকগুলো মোটা মোটা ডাল আছে। সেগুলো কেটে, কিছু বিক্রি করে দাও, কিছু দিয়ে ঘর সারাইয়ের কাজ করো।

–আরে! এত সুন্দর সমাধান তোমার কাছে থাকতে আমি কোথায় দুনিয়া ঘুরে হাওলাত খুঁজে বেড়াচ্ছি।

জুনাইদ গাছের ডালগুলো কেটে নিয়ে চলে গেল। আমগাছটা আবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে রইল।

এক গ্রীষ্মের দিনে, প্রচণ্ড গরমে চারদিক তপ্ত হয়ে আছে। জুনাইদ কী মনে করে গাছের কাছে এল। গাছটা খুব খুশি হয়ে বললো,

–খেলবে আমার সাথে?

–এই বয়েসে কেউ খেলে? চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছি। এখন কর্মহীন ঘরে বসে থাকতে একটুও ভালো লাগে না। ভাবছি একটা কাঠের নৌকা বানিয়ে, নদীতে ঘুরে বেড়াব। তুমি কি কোনও সহযোগিতা করতে পার?

–এ আর এমন কী? তুমি আমাকে কেটে ভাল একটা কাঠের নৌকা তৈরি করো। তারপর যেদিকে খুশি ভ্রমণে বের হও।

পৌঢ় জুনাইদ তাই করলো। এরপর অনেক দিন তার দেখা নেই। দীর্ঘদিন পরে, বৃদ্ধ জুনাইদ শেষবারের মতো গাছের কাছে এল। তাকে দেখেই গাছটা বললো,

–দুঃখিত বৎস! আমার কাছে তো তোমাকে দেয়ার মতো কিছুই বাকী নেই। কোন আমও নেই যে তোমাকে খেতে দেব।

–আমারও দাঁত নেই যে, আম খাবো।

–আমার ডালপালা-গুঁড়ি কিছুই তো নেই, থাকলে তো তুমি কিছু একটা বানাতে পারতে।

–কিছু বানিয়ে চালানোর মতো সেই বয়েস কি আর আছে?।

–কিন্তু তোমাকে কিছু দিতে না পারলে যে আমার খুবই খারাপ লাগবে? দেয়ার মতো কিছুই তো আমার কাছে আর অবশিষ্ট নেই। থাকার মধ্যে আছে আমার মরা শেকড়গুলো।

–সত্যি করে বলছি, আমার কিছুর প্রয়োজন নেই। আমার একটা চিরবিশ্রামের জন্য জায়াগা প্রয়োজন। সেটা পেলেই শান্তিতে দু'চোখ মুদতে পারি।

–এটা নিয়ে এত চিন্তিত হচ্ছো কেন? আমার শেকড়গুলো তুলে ফেললেই সুন্দর একটা কবরের জায়গা হয়ে যাবে। আর শেকড়গুলোকে তুমি কবরের ছানি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। তোমার এটুকু কাজে আসতে পারলেও আমার খুব ভালো লাগবে বন্ধু!।

জীবন জাগার গল্প : ৫৫৮

রিকশা চালিয়ে হজ্জ

কথা হচ্ছিলো হজ্জ নিয়ে। সবাই হজ্জ থেকে ফিরে আসছেন। আমাদের হৃদয়টা উথালপাতাল করছে, কবে যাবো, কবে যাবো!

একটা কথা আমাকে সান্ত্বনা যোগায়,

–হজ্জ অর্থ হলো 'ইচ্ছা' করা। যার ইচ্ছা বা নিয়তটা যত প্রবল তার হজে যাওয়ার সম্ভাবনাও ততটা প্রবল।

হজে যাওয়ার মৌলিক উপাদান তিনটা,

এক: অত্যন্ত শক্ত করে নিয়ত করা।

দুই: নিজের সামর্থ অনুযায়ী টাকা জমাতে থাকা। এক টাকা করে হলেও।

তিন: মন উজাড় করে দু'আ করা।

হজ্জ মানে হলো আল্লাহর মেহমানদারি। আমি হজে যেতে চাই, একথার অর্থ হলো:

-আমি আল্লাহর মেহমান হতে চাই।

একজন সাধারণ মানুষের ঘরে যেচে মেহমান হতে চাইলে লোকটা চক্ষুলজ্জার কারণে হলেও তাকে একবেলা দাওয়াত দিয়ে ভালাবুড়া রান্না করে খাওয়ায়।

আল্লাহ তো সবচেয়ে বড় মেহমাননেওয়ায। বড় অতিথিসৎকারক। আমরা তার ঘরে মেহমান হতে চাচ্ছি আর তিনি ফিরিয়ে দেবেন, এটা কেন যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

এবার একজন হাজি সাহেব সুন্দর এক কারগুযারি শোনালেন,

-এবার হজ্জে গিয়ে, আল্লাহর কুদরতের দারুণ এক নিদর্শন দেখলাম। আমাদের কাফেলায় একজন রিকশাচালকও হজে গিয়েছেন। আমি শুরু থেকেই কৌতূহলী ছিলাম, এই লোক রিকশা চালিয়ে কিভাবে হজে এলো? একদিন শরম ভেঙে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম,

-ভাই! আপনি কিভাবে হজ্জে এলেন?

-আমি তো রিকশা চালাই, সেটা জানেন। একবার ওয়াজে শুনলাম, কেউ যদি মনেপ্রাণে হজে যেতে চায় আল্লাহ তাকে নিয়েই যান। আমি একথা শুনে তখন থেকে উতলা হয়ে আছি। নিয়মিত দু'আ করে আসছি। কিন্তু মনে প্রশ্ন দেখা দিলো, টাকা-পয়সা ছাড়া কিভাবে যাবো? আমার কোনও ব্যাংক-

ব্যালেন্স নেই। জমিও নেই জমাও নেই। বড় সংসার, দু'টা টাকা যে জমাবো সে উপায়ও নেই।

কোথাও ওয়াজ হলে সেখানে রিকশা নিয়ে হাজির হয়ে যাই। একবার ওয়াজ শুনতে গেলাম। হুযুর বললেন,

-অনেকে দুনিয়ার ব্যাংকে-সমিতিতে টাকা জমা রাখে। আল্লাহর ব্যাংকে কেউ টাকা জমা রাখে না। আল্লাহ বলেছেন, আমাকে তোমরা কর্জে হাসানা দাও। আমি সেটা তোমাদেরকে অনেক গুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবো।

আমি সেদিন থেকে ঠিক করলাম, আমিও আল্লাহর কাছে কর্জে হাসানা রাখবো। পরে, হজে যাওয়ার জন্যে এই কর্জ আল্লাহর কাছ থেকে ফেরত চাইবো। নিয়ত করলাম, প্রতিদিন শেষ খেপটা আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মারবো। যাত্রী থেকে কোনও ভাড়া নেবো না।

আমার ভাড়াহীন শেষ খেপ শুরু হলো। একদিন শেষ খেপ মেরে বাসায় ফিরছি, এমন সময় দেখলাম রাস্তার পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ডাক দিলো। বললাম,

-আমি ভাড়া যাবো না।

-ভাই চলুন না,একজন অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে নিতে হবে। এত রাতে গাড়ি পাবো কোথায়? ডেলিভারি কেস। রুগির অবস্থা আশংকাজনক। এখন এই মুহূর্তে হাসপাতালে নিতে না পারলে, বাচ্চা ও মা দু'জনেরই মারা যাওয়ার আশংকা।

এ অবস্থায় কেউ না করতে পারে, বলুন? আমি হাওয়ার ওপর দিয়ে রিকশা চালিয়ে তাদেরকে হাসপাতালে পৌছে দিলাম। ভাড়া দিতে চাইল। আমি নিতে চাইলাম না। জোর করে ভাড়া আরও বাড়িয়ে দিতে চাইলো। তবুও নিলাম না। লোকটা বললো,

-ভাই রাগ করেছেন? ভাড়া নিবেন না কেন?

-না না রাগ করিনি। এমনিতেই ভাড়া নিচ্ছি না। আপনি রুগিকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান।

-না, আগে আপনাকে ভাড়া নিতে হবে। তারপর অন্য কিছু।

এরপর আমি ঘটনা খুলে বলতে বাধ্য হলাম।

-আমি আসলে প্রতিদিন শেষ খেপ মেরে টাকা নেইনা।

-কেন?

-আমি টাকাটা আল্লাহর কাছে কর্জে হাসানা হিশেবে রাখি।

-সে আবার কী?

আমি হুযুরের কাছে শোনা ওয়াজটার কথা বললাম। এরপর বললাম,

-আমার হজে যাওয়ার খুবই ইচ্ছা। তাই আমি ঠিক করলাম, আমার যেহেতু টাকা-পয়সা অত নেই, তাই আল্লাহর কাছে টাকাটা জমা রাখলেই বেশি লাভে ফেরত পাওয়া যাবে। সেদিন থেকে আমি শেষ খেপ মেরে টাকা নেই না। টাকাটা আল্লাহর কাছে জমা থাকে।

আজকে আপনাকে হাসপাতালে আনার আগে, আজকের শেষ খেপটা মেরে ফেলেছিলাম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, আপনারাই আমার আজকের শেষ খেপ।

হাসপাতাল থেকে চলে এলাম। এরপর অনেক দিন কেটে গেছে। ততদিনে সেই রাতের ঘটনার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এক জুমাবারে বায়তুল মুকাররম উত্তর গেটে বসে আছি। এমন সময় একজন লোক আমাকে দেখামাত্রই দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে বললো,

-আমাকে চিনতে পেরেছেন?

-না তো!

-ওই যে এক রাতে আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম?

-ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। তা ভালো আছেন?

-জি, আলহামদুলিল্লাহ। জানেন, আপনার খোঁজে আমি পুরো ঢাকা শহর চষে ফেলেছি?

-কেন?

-আমার আব্বা ইন্তিকাল করেছেন বছর দুই হলো। তিনি হজ্জ করে যেতে পারেননি। আমাদের ভাইবোনদের ইচ্ছে, আব্বার বদলি হজ্জ করাবো। আমরা সবাই ভাবছিলাম, কাকে পাঠানো যায়? কাকে পাঠানো যায়? হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়লো। ঘটনাটা খুলে বললাম। সবাই শুনে তো এক কথায় রাজি, আপনাকেই আব্বার বদলি হজ্জ করার জন্য পাঠাবো। সেই থেকে আপনাকে খুঁজছি।

আমাদের ইমাম সাহেব বলেছেন, আগে হজ্জ করেছে এমন একজনকে পাঠাতে। আমরা বললাম,

-দরকার হলে ওনাকে দুইবার পাঠাবো। প্রথমবার নিজেরটা করে আসবে। পরেরবার আব্বারটা।

জীবন জাগার গল্প : ৫৪৯

রাজার নামায

বাদশাহ শিকারে গিয়েছেন। শিকার করতে করতে লোকজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। এমন সময় নামাযের সময় হলো। বাদশাহ নামাযে দাঁড়ালেন। বনের মধ্যে এক কুটিরে বাস করে এক গরীব লোক। সৈন্যদেরকে পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্যে সাথে গিয়েছে। রাত নেমে আসছে, কিন্তু স্বামী ঘরে ফিরে আসছে না দেখে, লোকটার বউ তাকে খুঁজতে বের হলো।

আবছা অন্ধকারে নামায পড়ারত রাজার সাথে ধাক্কা খেলো। রাজার পা মাড়িয়ে সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেলো। কোনও ক্ষমা প্রার্থনা না করেই। রাজা নামাযে থাকায় কিছু বলতে পারলেন না।

স্বামীকে খুঁজতে খুঁজতে বনের বাইরে এক জায়গায় গিয়ে স্বামীকে পেল। সৈন্যদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করলো,

-এই বনের মধ্যে আমাদের রাজামশায়কে দেখেছো?

-না আমি কাউকে দেখিনি।

সৈন্যরা জামাই-বউকে সাথে নিয়ে বনের মধ্যে প্রবেশ করলো। কিছুদূর যাওয়ার পর, সৈন্যরা রাজার দেখা পেল। একটা গাছের নিচে বসে আছেন। রাজা মহিলাকে দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। হুংকার দিয়ে বললেন,

-এই বেত্তমিয মহিলা! আমাকে দেখতে পাওনি? নামায পড়ছিলাম আর তুমি আমার পা মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেলে?

-না জাঁহাপনা! আমি মোটেও খেয়াল করিনি। অন্ধকার ছিলো তো তাই।

-এতবড় একটা মানুষকে তুমি চোখে দেখলে না, চোখের মাথা খেয়েছিলে!

-আমি আমার স্বামীর জন্যে দুশ্চিন্তায় বিভোর ছিলাম। অন্য কোনও দিকে খেয়াল ছিলো না। আগেও একবার এমন হয়েছে। তিনি রাতের আঁধারে হারিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মাঝেমধ্যে অন্ধকারে চোখে দেখতে পান না। তবে বেশিরভাগ সময়ই তার চোখ ভাল থাকে। কিন্তু জাহাঁপনা! আমার মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অভয় দিলে বলতে পারি!

-কী প্রশ্ন?

-আমি আমার স্বামীর চিন্তায় অস্থির ছিলাম। একজন মানুষের চিন্তায় মগ্ন, সেজন্য আমার কোনও দিকে খেয়াল ছিল না। কিন্তু আপনি তো মানুষের স্রষ্টার প্রেমে মশগুল ছিলেন। তবুও আপনি কিভাবে টের পেলেন যে আমি আপনার পা মাড়িয়ে দিয়ে গেছি?

জীবন জাগার গল্প: ৫৫০

কৃপণের মেহমানদারি

এক হাড়-কিপটে লোকের ঘরে মেহমান এল,

কিপটে : কি খাবেন, ঠাণ্ডা না গরম??

মেহমান : ঠাণ্ডা

কিপটে : পেপসি নাকি রুহ আফজা??

মেহমান : পেপসি

কিপটে : গ্লাসে খাবেন নাকি বোতলে??

মেহমান : গ্লাসে

কিপটে : নরমাল গ্লাসে না ডিজাইনওয়ালা গ্লাসে??

মেহমান: ডিজাইনওয়ালা গ্লাসে

কিপটে :কি ডিজাইন ফুলের নাকি ফলের??

মেহমান : ফুলের ডিজাইন

কিপটে: কি ফুল গোলাপ না বেলি?

মেহমান : গোলাপ ফুলওয়ালা

কিপটে : বড় বড় গোলাপফুল ওয়ালা নাকি ছোট ছোট?

মেহমান : ছোট ছোট

কিপটে : সরি আপনাকে তাহলে আমি আর পেপসি খাওয়াতে পারলাম না। কারণ আমার ঘরে ছোট ছোট গোলাপের ডিজাইনওয়ালা কোন গ্লাস নেই!!! বেড়াতে আসার জন্য ধন্যবাদ! আবার আসবেন!!!

জীবন জাগার গল্প: ৫৫১

বেদুঈনের দু'আ

এক লোক মারা গেলো। তার আচার আচরণে পাড়া প্রতিবেশী অতিষ্ঠ ছিলো। জানাযা উঠানোর জন্য কেউ এগিয়ে এলো না। একমাত্র ছেলে বাবার লাশকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে মরুভূমিতে নিয়ে গেল। সেখানেই দাফন করবে।

সেখানে একজন বেদুঈন মেষ চরাচ্ছে। এগিয়ে এসে জানতে চাইলো,

-আর বাকি লোকেরা সব কোথায়? একা একা দাফন করছো কেন?

বাবাকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করতে মন সায় দিলো না। সে কোনও উত্তর না দিয়ে বারবার বলতে লাগলো,

-লা হাওলা ওয়া লা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কোনও শক্তি নেই। সামর্থ্য নেই।

বেদুঈন যা বোঝার বুঝে নিলো। কাফন-দাফনের কাজে হাত লাগালো। দাফন কার্য সমাধা হলো।

বেদুঈন দুহাত আকাশের দিকে তুলে বিড়বিড় করে কী যেন দু'আ করলো। তারপর কোনও কথা না বলে, মেষ নিয়ে মরুভূমির দিকে চলে গেলো।

সেই রাতেই ছেলে স্বপ্নে দেখলো, তার বাবা উঁচু জান্নাতে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ছেলে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো:

-আব্বু! আপনার এই উত্তরণ কিভাবে ঘটলো? এমনটাতো হওয়ার কথা নয়?

-এমনটা ঘটেছে, বেদুঈন লোকটার দু'আর বদৌলতে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছেলে ছুটলো। মরুভূমির দিকে। অনেক খুঁজে বেদুঈনকে বের করলো। প্রশ্ন করলো, আপনি আমার আব্বার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে কী দু'আ করেছিলেন?

-আমি দু'আ করেছিলাম, ইয়া আল্লাহ! আমি একজন কারীম। অতিথিপরায়ণ। আমার কাছে কোনও মেহামান এলে আমি তার যথাযথ সম্মান করি।

কবরে শায়িত এই বান্দাও এখন আপনার মেহমান। আর আপনি তো আকরামুল আকরামীন। শ্রেষ্ঠতম অতিথিপরায়ণ।

সন্ড্রন নয়। নয় সম্পদ। অধিক নেক আমলও নয়। বাঁচাতে পারে একমাত্র আল্লাহ রহমতের সাগরের ঢেউ।

সে সাগরে যে ঘাট দিয়েই পারা যায় ঝাঁপ দিবো। আমি যে কাজ ভালো পারি সেটার মাধ্যমেই রহমতের সাগরে ঢেউ তুলবো। ইনশাআল্লাহ

জীবন জাগার গল্পঃ ৫৫২

ফেসকৌতুক

ভোর রাতে একজনের স্ট্যাটাস,

- "সেহেরী খাওয়ার সময় হয়েছে আর ঘুমাবেন না সবাই জেগে উঠুন, সেহেরী খেয়ে নিন"

সে পোস্টে আরেকজনের কমেন্ট-

-"ধন্যবাদ, স্ট্যাটাস দিয়ে আমাদেরকে জাগানোর জন্য। অল্পের জন্য সেহেরী মিস করিনি"।

আরেকজনের কমেন্ট-

-"আপনার স্ট্যাটাসের আগেই আমি সবাইকে ফেসবুকে মেসেজ দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছি"।

আরেকজন লিখেছে,

- "আগে থেকেই খেয়াল রাখছিলাম, আপনার স্ট্যাটাস দেখা মাত্রই উঠে গেছি। থ্যাংকস ভাই!"

এটা দেখে আরেকজনের স্বগতোক্তি,

-মনে মনে চিন্তা করে দেখলাম, সবাই দেখি ডিজিটাল.... খালি আমিই এনালগ থেকে গেলাম !!

আজ থেকে আমিও ঘুম থেকে জাগার জন্য ফেসবুকের হোম পেইজে চোখ রাখবো, আর আপনারাও আমাকে স্ট্যাটাস দিয়ে জাগাবেন।

জীবন জাগার গল্পঃ ৫৫৩

অবস্থানের পার্থক্য

আজকে ছিলো সাপ্তাহিক বাড়ির কাজ জমা দেয়ার দিন। অংক স্যার প্রতি বৃহস্পতিবারে একগাদা অংক দিয়ে দেন। পরের বৃহস্পতিবারে খাতা জমা নেন। শনিবারে স্যার সবার খাতা ফিরিয়ে দেন। ভুলগুলো দাগিয়ে দেন। সঠিক উত্তরটাও পাশে লিখে রাখেন। স্যার দুই বছর হলো এই স্কুলে এসেছেন। এরই মধ্যে তিনি ছাত্রদের অংকের দুর্বলতা প্রায় সারিয়ে এনেছেন। প্রাইভেট পড়ানো তাঁর পছন্দ না। ক্লাশের মধ্যেই তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ছাত্রদেরকে পড়া বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন।

ছাত্রদের খাতা তুলে স্যারের বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে দুইজনকে। ফার্স্টবয় খালিদ আর সেকেন্ডবয় আরিফকে। দু'জনেই আজ খাতাগুলো জমা করল। খালিদ জিজ্ঞাসা করলো:

-আরিফ! সাত নাম্বার অংকটা মিলাতে পেরেছ?

-জি।

-কিভাবে দেখি?

খালিদ খাতা দেখে বললো,

-তুমি তো অংকটা ভুল পদ্ধতিতে করেছো।

-নাহ, আমি ঠিকভাবেই করেছি। তোমার বুঝতে ভুল হচ্ছে বোধহয়।

এক কথা দু'কথার পর দু'জনের মাঝে তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। দু'জনেই নিজ অবস্থান অটল। ছাত্ররাও এই বিতর্কে যোগ দিল।

স্যার এসে দেখলেন, সবাই গলার স্বরকে উচ্চগ্রামে চড়িয়ে ঝগড়া করছে। চুপচাপ চেয়ারে গিয়ে বসলেন। সবাই ঝগড়া থামিয়ে যে যার আসনে গিয়ে বসলো। স্যার জানতে চাইলেন,

-কী নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল?

-একটা অংক নিয়ে স্যার।

-কই দেখি?

স্যার খাতা দুটো দেখলেন। তারপর খালিদ আর আরিফকে ডাকলেন।

-সবাই ক্লাসের দরজা-জানালা বন্ধ করে দাও। বাতিও নিভিয়ে দাও।

স্যার এবার টেবিলের ওপর থাকা পৃথিবীর গোলকটা টেবিলের ঠিক মাঝ বরাবর এনে রাখলেন। এক পাশে একটা মোম জ্বালিয়ে দিলেন।

-এবার তোমরা দু'জন টেবিলের দু'পাশে দাঁড়াও। খালিদ তুমি বলো তো গ্লোবটার রঙ কেমন?

-কালো, স্যার!

-আর আরিফ! তুমি কী বলো?

-আমি তো স্যার! গ্লোবটার রঙ নীলচে দেখতে পাচ্ছি।

-ঠিক আছে। এবার দু'জনে জায়গা বদলে একজন আরেক জনের জায়গায় দাঁড়াও। খালিদ তুমি বলো গ্লোবটার রঙ কী?

-নীলচে, স্যার!

-আর আরিফ! তুমি?

-কালো স্যার!

-দেখ! দু'জনের অবস্থান বদলের সাথে সাথেই একই জিনিসের রঙটা বদলে গেছে। তোমাদের দু'জনের অংকই সঠিক হয়েছে। তবে দু'জন দুইভাবে অংটা মিলিয়েছ। পথ দুইটা, গন্তব্য একটা।

= যখনই কারো সাথে মতে মিল না হবে, প্রথমেই যাচাই করে নিবে তোমার অবস্থান আর তার অবস্থান এক কিনা। এক না হলে ঝগড়া করার কোনও মানে হয় না। দুইজনের অবস্থান ভিন্ন হলে দৃষ্টিকোণও ভিন্ন হবে। মতামতও ভিন্ন হবে। তাকে তার অবস্থান থেকে তোমার অবস্থানে আনতে চেয়ো না। তাহলেই বিপাকে পড়বে। ঝগড়া-মারামারি বাঁধবে।

জীবন জাগার গল্প: ৫৫৪

ময়দান থেকে ময়দানে!

জর্দানে তাবলীগ জামাত গেল। একটু পরেই একটা মাইক্রোবাস মসজিদের সামনে এসে থামল। কয়েকজন সামরিক অফিসার জামাতের যুবক সদস্যদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেল।

.

আমীর সাহেব গোয়েন্দা দফতরে খোঁজ করতে গিয়ে জানালেন,

-আমরা তো কোনও ধরনের রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করি না। তবুও কেন গ্রেফতার করা হলো?

-তোমরা যুবকদেরকে কফিশপ থেকে ধরে ধরে মসজিদে নিয়ে যাও।

-সে তো ভাল কাজ!

-রাখো, কথা শেষ হয়নি। যুবকরা মসজিদে যাওয়ার পর, ইখওয়ান এসে তাদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজনীতিতে নিয়ে যায়। যুবকরা যখন দেখে রাজনীতি দিয়ে ইসলাম কায়েম হবে না। তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা সৃষ্টি হয়। তখন জিহাদীরা এসে তাদেরকে জিহাদে নিয়ে যায়।

= আমাদের আপত্তি এখানেই। তোমাদের তাবলীগ নিয়ে আমাদের আপত্তি নেই। রাজনীতিতে খুব একটা আপত্তি নেই। কিন্তু জিহাদ? সেটা বড়ই বিপজ্জনক! বাদশাহর জন্যে তো বটেই, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ইসরাঈলের জন্যেও!

জীবন জাগার গল্প: ৫৫৫

চেইন অব হ্যাপিনেস!

সুন্দর একটা পার্ক। কেউ বেঞ্চিতে বসে আছে। কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। হকাররা এলোমেলো পশরা নিয়ে ঘুরছে। একজন যুবতী একা বসে বসে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

.

ছোট্ট একটা মেয়ে হেঁটে হেঁটে হাতরুমাল বিক্রি করছিল। তার চোখ পড়লো কান্নারত যুবতীর ওপর। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে পিঠে হাত দিয়ে একটা রুমাল বাড়িয়ে দিল। ইশারায় চোখ-মুখ মুছে ফেলতে বললো।

.

যুবতী অবাক! তবুও কান্না থামিয়ে মুখ মুছল। রুমালের দাম চুকানোর জন্যে, ভ্যনিটি ব্যাগ খুলে হাতড়াতে লাগল। টাকা বের করে দেখে, ছোট্ট মেয়েটা টাকা না নিয়েই চলে গেছে। অনেক দূরে।

.

যুবতী স্বামীর সাথে ঝগড়া করে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। ছোট্ট খুকিটার আচরণে তার মনটা ভীষণ ভাল হয়ে গেল। সকালের তিক্ত ঝগড়ার সামান্য রেশও মনে অবশিষ্ট থাকলো না। সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে স্বামীর কাছে একটা সুন্দর মেসেজ পাঠাল।

.

স্বামী বেচারা মনের দুঃখে একটা রেস্টুরেন্টে মন খারাপ করে বসে ছিল। সামনে এক গাদা খাবার। কিন্তু গলা দিয়ে একটা দানাও নামাতে পারছে না। মনে এত জ্বালা নিয়ে খাওয়া যায়? হঠাৎ মোবাইলে মেসেজ টোন বেজে উঠলো। দেখবে না দেখবে না করেও মোবাইলটা হাতে নিল।
= স্ত্রীর মেসেজ!
স্বামী ভীষণ অবাক হলো। এমনটা তো সচরাচর ঘটে না! ঝটপট মেসেজটা পড়ে স্বামী আকাশ থেকে পড়লো।
–সে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে! কী আশ্চর্য! কী আনন্দ!
টেবিলে খাবারগুলো আধখাওয়া রেখেই উঠে পড়লো। বেয়ারাকে বিল আনতে বললো। তুরন্ত বিল মিটিয়ে বের হয়ে এল। কী মনে করে আবার রেস্তোরাঁয় দরজা ঠেলে প্রবেশ করলো। বেয়ারার হাতে মোটা অংকের একটা নোট গুঁজে দিল। বেয়ারা এতবড় নোট দেখে রীতিমতো ,আকাশ থেকে পড়লো। তার হাসি দু'কানে গিয়ে ঠেকলো।

.

বিকেল বেলা। রেস্তোরা এখন বন্ধ হয়ে যাবে। বেয়ারা তার আটপৌরে ইউনিফর্ম ছেড়ে বাড়ির পোষাক পরলো। সুপার মার্কেটে গিয়ে দু'হাত খুলে বাজার করলো। অনেকদিন ঘরে ভালাবুড়া রান্না হয় না। ব্যাগভর্তি বাজার হাতে ঘরে ফিরছে। সামনে পড়লো বড় মসজিদ। আসরের আযান হচ্ছে। কোনও দিন যা করে না, আজ তাই করলো। ওযু করে নামাযটাও পড়ে নিল। মনটা আজ বেশ ফুরফুরে। এত বাজার করার পরও পকেটে অনেক টাকা! নামায পড়ে বের হলো। মসজিদের সামনে বিশাল চত্তর। ঝাঁক ঝাঁক পায়রা উড়ছে। একটা জীর্ণ কাপড় পরা শীর্ণ বুড়ি বসে আছে। সামনে ছোট ছোট প্যাকেটে গম-যব-ভুট্টা রাখা আছে। বেয়ারা দ্রুত বুড়িমার কাছে গেল:

–সবগুলো প্যাকেট একসাথে কত?

–একশ টাকা।

বুড়ির মুখে ফোকলা হাসি। আজ ভালোই বেচাকেনা হয়েছে। বেয়ারা পকেট থেকে একশ টাকার দুইটা নোট বের করে বুড়ির দিকে এগিয়ে দিল। কিছু না বলে, পেছনের দিকে না তাকিয়ে হন হন করে হাঁটা দিল।

.

বুড়ি তখন খুশিতে চতুর্থ আসমানে। তাড়াতাড়ি লাঠিটা হাতে নিয়ে ঠকঠক বাড়ির পথ ধরলো। পাড়ার ছোট্ট বাজারে গিয়ে কী মনে করে একটা মোরগ কিনল। সাথে প্রয়োজনীয় মশলাপাতি। মুচকি হাসতে হাসতে ঘরে ফিরল। রান্না চড়িয়ে দিল। সব শেষ করে, খাবার সাজিয়ে ফেললো। জোরে ডাক দিল,

–নাদিয়া! এসো দাদুভাই! রাতের খাবারটা আজ একটু আগেই সেরে ফেলি! খাবারের পর আবার পড়তে বসো!

একটা ছোট্ট বালিকা খরগোশের মতো ছুটতে ছুটতে হাযির হলো।

–ও মা! দাদু এ যে মোরগ রান্না করেছ! আগে বলবে তো! ইশ কত্তো দিন হলো, মোরগের গোশত খেয়েছি!

–আজ কয়টা রুমাল বিক্রি করেছো?

–একটাও না!

–তাহলে একটা রুমাল কম দেখলাম যে...............!

জীবন জাগার গল্প : ৫৫৬

আকাশসম মন

উমর বিন উবাইদুল্লাহ (রহ.) কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানবীর, মহৎ। একটা বাগান পড়লো চলার পথে। দেখলেন একজন যুবক খাবার খেতে বসেছে। সামনে একটা কুকুর বসে আছে। যুবকটা একমনে খাবার খাচ্ছে। এক লোকমা নিজে খাচ্ছে আরেক লোকমা কুকুরটাকে খেতে দিচ্ছে।

.

উমর (রহ.) অবাক হয়ে গেলেন দৃশ্যটা দেখে। এগিয়ে গিয়ে জানতে চাইলেন,

-যুবক! কুকুরটা কি তোমার?

-জি না, জনাব।

-তাহলে কুকুরটাকে এভাবে খেতে দিচ্ছ যে?

-আমি খেতে বসেছি, আল্লাহর একটা মাখলুক আমাকে খেতে দেখছে আর আমি তাকে কিছু না দিয়ে নিজেই সবটুকু খাবার খেয়ে ফেলছি। এটা একটা লজ্জার বিষয় নয় কি?

-তুমি কি দাস না মুক্ত?

-আমি ওই বাগান-মালিকের দাস।

.

উমর (রহ.) বাগানের দিকে গেলেন। একটু পর ফিরে এসে যুবককে বললেন,

-যুবক! সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন। আর ওই বাগানের মালিকও এখন থেকে তুমি।

-তাই? তাহলে আপনিও সাক্ষী থাকুন, এই বাগানের সমস্ত ফল আমি মদীনার দরিদ্রদের জন্যে হেবা করে দিলাম।

-আশ্চর্য তো! তুমি গরীব হয়েও এমনটা করতে পারলে? তোমার নিজের জন্য তো কিছু রাখতে পারতে?

-আল্লাহ আমাকে মুক্তহস্তে একটা বাগান দান করলেন, আর আমি সেটা নিয়ে কৃপণতা করবো?

জীবন জাগার গল্প: ৫৫৭

তুমি চলে গেছ অনেকদূরে!

সে আমাকে কথা দিয়েছিল, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমার পাশে থাকবে। কিন্তু সে কথা রাখলো না। চলে গেছে আমাকে ছেড়ে।

.

কাঁদছিলেন আর কথাগুলো বলছিলেন মুহাম্মাদ বিলাল। মিনার হাসপাতালের দেয়ালে হেলান দিয়ে আছেন। শাদা ইহরামের কাপড় এখানে ওখানে ছিঁড়ে গেছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দূরে রোদে চিকচিক করা বালিয়াড়ির দিকে।

.

কেমন যেন হয়ে গেছেন। উদ্ভ্রান্তের মতো। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক বাংলাদেশীর কাছে বারবার জিজ্ঞেস করছেন,

-আমার স্ত্রীকে দেখেছেন? সে কোথায় আছে?

আরেক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দ্বিতীয় বাংলাদেশী আবদুল আলীম তার কাঁধে সান্ত্বনার চাপড় দিতে থাকেন। বাকরুদ্ধ কণ্ঠে কিছু বলতে গিয়েও পারেন না। এবার দু'জনে একসাথে ডুকরে কেঁদে ওঠেন। আরেক জন এগিয়ে এসে, কুরআনের একটা আয়াত পড়লেন। থাকতে না পেরে তিনিও কেঁদে ফেললেন।

.

বিলালের আহাজারি,

-আমার স্ত্রী চলে গেছে রে! সে তো হজ্জটা শেষ করে যেতে পারল না রে! সে তো আমার সাথেই ছিল। আমি তার হাত ধরে ছিলাম। সে মরে গেল! আমাদের তিনটা সন্তানকে এখন কে দেখবে রে!

.

পুরুষ মানুষ এভাবে কাঁদলে অন্যদেরও স্থির থাকা কঠিন হয়ে যায়।

.

বিলাল কান্নাভেজা কণ্ঠে বলেন:

-আজ বিশ বছর ধরে সৌদির আরবের যাহরানে কাজ করছি। আরও আগে দেশে ফিরে যেতাম। শুধু আমার স্ত্রীকে হজ্জ করিয়ে দেশে যাবো এ-কারণেই এতটা কাল কষ্ট করে থেকে গেছি। তিল তিল করে টাকা জমিয়েছি, ওকে হজে আনার জন্যে।

বেচারির বড়ো শখ ছিল হজ্জ করার। কিভাবে, কোত্থেকে তার হজ্জের প্রতি এত আগ্রহ বলতে পারবো না। তার এত আগ্রহ দেখে, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তাকে হজ্জ না করিয়ে দেশে যাব না।

.

এবার দু'জনে একসাথে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। জীবনের বাকি দিনগুলো একসাথে থাকার কথা ছিল। কিন্তু সে তো থাকলো না। আমি এখন দেশে গিয়ে কী করবো? কিভাবে তিন সন্তানকে আমার মুখ দেখাবো রে!

.

আসার সময় তিন সন্তানকে ধরে সে এত বেশি কেঁদেছিল, তখন কেউ কেউ বলেই ফেলেছিল, এটা তো শেষ বিদায়ের কান্না! সেটাই তো ফলে গেল রে!

.

আমি আর সে কংকর নিক্ষেপ শেষ করেছি। সাড়ে সাতটার দিকে। ফিরে যাচ্ছি তাঁবুতে। ২০৪ নাম্বার পথ ধরে। হঠাৎ উল্টোদিক থেকেও হাজীরা আসতে শুরু করলো। আমরা দৌড়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমাদের লাইনেই এত ভীড়, কোনওদিকে সরার উপায় ছিল না।

.

মুখোমুখি ধাক্কা লাগার সাথে সাথে অনেক লোক মাটিতে পড়ে গেল। আমার স্ত্রীও পড়ে গেল। আমিও। আমাদের দু'জনের ওপর আরও অনেকে পড়ল। আমার দমবন্ধ হয়ে এসেছিল। নিচের পিচঢালা পথ তখন আগুনের চেয়েও অনেকগুন বেশি উত্তপ্ত। আমি পড়ার সাথে সাথেই ছ্যাঁৎ করে চামড়া ঝলসে গেল। ব্যথার কারণেই কি না জানি না, আমি সর্বশক্তি ব্যয় করে কোনও রকমে নিজেকে বের করে আনতে সক্ষম হলাম।
দাঁড়িয়েই দেখতে পেলাম 'ও' তখনো চাপা পড়ে আছে। মুখটা হাঁ হয়ে গেছে। দু'চোখ আকাশের দিকে। হাউমাউ করে চিৎকার করে উঠলাম,
-আমার স্ত্রীকে বাঁচাও! আমার স্ত্রীকে বাঁচাও!
কিন্তু কে শোনে কার কথা! সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আমার হাত-পা-পিঠ-মুখ তীব্রভাবে ঝলসে গিয়েছিল। নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। তবুও ঝিম খিঁচে উঠে গেলাম। তাকে টেনে বের করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ!

.

তবে একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছি, সে কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে মারা গেছে!

সে পবিত্রভূমিতে সমাহিত হবে। এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়!

জীবন জাগার গল্প: ৫৫৮

অজ্ঞ-বিজ্ঞ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশে চালু হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক শাসন। আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ.-ও সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

.

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামী আইনমতে শাসিত হওয়ার লক্ষ্যে। কিন্তু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর দেখা গেল, এ-ব্যাপারে গড়িমসি হচ্ছে।

.

হযরত উসমানী রহ.- বারবার ইসলামী শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্যে জোর তাকিদ দিচ্ছিলেন। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম আহমদের কাছে বিষয়টা সহ্য হলো না। তিনি সরাসরি বলেই ফেললেন:

-মাওলানা! এটা তো রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, আপনারা আলিম হয়ে এসবের কী বুঝবেন? এসব জটিল বিষয়ে আপনাদের নাক না গলানোই উচিত।

.

হযরত উসমানী (রহ.) গভর্নর জেনারেলের কথার উত্তরে বললেন,

-ওলামায়ে কেরাম আর আপনাদের মাঝে শুধু এ-বি-সি-ডি-এর পর্দা লাগানো আছে। আপনি ঠুনকো এ-পর্দা উঠিয়ে দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কে অজ্ঞ, আর কে বিজ্ঞ!

জীবন জাগার গল্প: ৫৫৯

মিনা প্রান্তরের কালো মেয়ে!

ছোট্ট একটি মেয়ে। শৈশব পার হয়েছে কি হয়নি। মিনা প্রান্তরে, ২০৪ নাম্বার সড়কের পাশে, একটি তাঁবুর ওপরের ছাউনিতে আটকে আছে। গুমরে গুমরে কাঁদছে। হেঁচকি উঠছে। দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা ঝরছে। কালো মেয়েরা কি নীরবে কাঁদে?

.

উদ্ধারকর্মীরা এসে দেখল, একটা কালো মেয়ে শিশু একটা তাঁবুর চালু কার্নিশে একটা খুঁটি ধরে লটকে আছে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে আনা হলো।

মেয়েটি আধো আধো বুলিতে যা বললো,

-আমি ছিলাম আব্বুর কাঁধে। আম্মু ছিলেন পাশে। আস্তে আস্তে ভীড় ঠেলে হাঁটছিল আব্বু-আম্মু। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ধাক্কা এল। আব্বু আম্মুর হাত ধরে ফেললেন। অনেক কষ্টে সোজা থাকার চেষ্টা করছিলেন। আরও জোরে ধাক্কা এল। আব্বু দেখলেন আর নড়াচড়াও করতে পারছেন না। তিনি করলেন কি, সর্বশক্তি একত্র করে, দূরে তাঁবুর দিকে আমাকে ছুঁড়ে মারলেন। আমি উড়ে গিয়ে তাঁবুর ওপরে এসে পড়লাম।

পড়েই খপ করে তাঁবুর একটা খুঁটি ধরে ফেলেছিলাম। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, আব্বু-আম্মু পড়ে গেছেন। তাদের দুজনের ওপর আরও মানুষ লুটিয়ে পড়ছে। তারপর আরও!

জীবন জাগার গল্প: ৫৬০

শেষচিঠি

বিয়ের রাতেই ময়দানের ডাক এল। বাসর-রুসমত হলো না। রুশ বোমারু বিমানের হামলায় শহীদ হয়ে গেলেন। শেষ মুহূর্তে সাথীদের হাতে একটা চিঠি দিয়ে বললেন,

-আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিও!

★★★

স্ত্রী অশ্রুসজল চোখে, চিঠিটা খুলে দেখল:

-নাদিয়া! তুমি আমার খেলার সাথী ছিলে। পর্দা করার পর থেকে আর দেখা হয়নি আমাদের। কথাও হয়নি। তবুও আমার মনে হতো, বিয়েটা তোমার সাথেই হোক! তুমি চাইতে কি না জানি না। জানতে পারিনি।

যখন থেকে ময়দানের মেহনতে যোগ দিয়েছি, ভেতরের স্বপ্নটাকে জোর করেই বের করে দিয়েছিলাম। কিন্তু শিয়ারা 'আবু বকর' নামের কারণে, আব্বুকে শহীদ করে দিল। মাকে সান্ত্বনা দিতে বাড়ি এলাম। তিনিই বললেন, তোমার বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

চাচা-চাচীরও খুব ইচ্ছে, বিয়েটা আমার সাথেই হোক।

★★★

আমি এককথায় প্রত্যাখ্যান করলাম। কারণ আমি যে 'ইস্তিশহাদী' জামাতে নাম লিখিয়েছি! তুমি প্রশ্ন করতে পারো,

-তবে কেন বিয়ে করলে?

নাদিয়া! রাগ করো না। আমি চিন্তা করেছি কি জানো, হাদীসে আছে ‘একজন শহীদ সত্তরজনের জন্যে সুপারিশ করতে পারবে’।

= আমি দুনিয়াতে তোমায় কিছু দিতে পারবো না। কিন্তু আখিরাতে তোমার নামে সুপারিশ করতে পারবো। যদি আমার শাহাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হয়।

জীবন জাগার গল্প: ৫৬১

একটি মেয়ের বায়োডাটা

নাম: ফিলিস্তীন।

বিবাহিত অবস্থা: তালাকপ্রাপ্তা। চার সন্তানের জননী।

সন্তানদের পরিচয়:

প্রথম সন্তান: নাকাবা (জাতীয় বিপর্যয়)। জন্ম ১৯৪৮ সালে।

দ্বিতীয় সন্তান: নাকাসা (জাতীয় দুর্যোগ)। জন্ম ১৯৬৭ সালে।

তৃতীয় সন্তান: ইন্তিফাদা (গণবিস্ফোরণ)। জন্ম ১৯৮৭ সালে।

চতুর্থ সন্তান: সাওরাহ (জাতীয় বিক্ষোভ-বিপ্লব)। জন্ম ২০০০ সালে।

আমি ছেলেবেলা থেকেই এতিম।

আমার পিতার নাম ‘আরব’। তিনি আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন। কোনরকম খোঁজ-খবর নেন না।

মায়ের নাম শাম (সিরিয়া অঞ্চল)। তিনি আজ থেকেও নেই।

আমরা একুশ ভাইবোন। তাদেরকে সবাই আরব দেশ বলে চেনে।

ভাইবোনদের কেউ আমাকে দেখতে আসে না। তারা আমাকে চেনেও না।

আমার বড় ভাইয়ের নাম ইরাক। তিনি সেই ২০০৩ সালে ইন্তেকাল করেছেন। ।

বড় ভাই মারা যাওয়ার পর আর কেউ আমাকে দেখতে আসেনি। সবাই তাদের সৎ পিতা আমেরিকাকে ভয় পায়। সৎ মা ইসরাঈল সবসময় স্বামীকে আগলে রাখে। অন্য ভাইবোনদেরকেও কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

আমার জীবনের লক্ষ্য: আশেপাশে কিছু দুর্বৃত্ত আনাগোনা করছে। তাদেরকে চিরতরে তাড়িয়ে দেয়া।

আমার সার্বক্ষণিক চাওয়া: নিজস্ব একটা বাড়িতে (বাইতুল মাকদিসে) গিয়ে নিরাপদে ঘর-সংসার পাতা।

এত কষ্টের মাঝেও আমার আবার বিয়ে হয়েছে। স্বামীর নাম আল জিহাদ। আমি এখন সন্তানসম্ভবা। কি হবে জানি না, তবে আমি দুইটা নাম বেছে রেখেছি।

= শাহাদাত বা নুসরাত।

জীবন জাগার গল্প: ৫৬২

টিকটিকির খাবার

তখন আমরা পটিয়া পড়ি। সুল্লামের বছর। মানে হিদায়া আউয়াল পড়ি। কুরবানির ছুটিতে কয়েকজন মিলে ঠিক করলাম,

এই ছুটিটা ঢাকায় কাটাবো। ঢাকায় নাকি আহলে হাদীসদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে। ওখানে কী একটা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। যারা অংশগ্রহণ করবে, তাদেরকে অনেক টাকা দেয়া হবে।

সেবার টাকার জন্য আনন্দমেলা আর 'দেশে'র পূজোসংখ্যাটা কিনতে পারিনি। ওই টাকা পেলে হয়তো একটা হিল্লে হবে। আমিও চট করে রাজি।

বাড়ি থেকে তাগাদা থাকায় আমার আর শেষ পর্যন্ত যাওয়া হলো না। গেলো সাইফুল হক আর নাসির। ছুটির পর দেখি দুইজনের বোলভাল বদলে গেলো।

আমি আর সাইফুল হক প্রতি নামাজের আগে কুরআন কারীমের একটা আয়াত নিয়ে তারকীব নিয়ে মারামারিতে লাগতাম।

কুরআনের আয়াত নিয়ে মারামারির এই মজার বিষয়টার কারণেই, আমরা সারাক্ষণ আজানের অপেক্ষায় থাকতাম। কখন আজান হবে আর আমরা তারকীব নিয়ে একজন আরেকজনকে ঘায়েল করার যুদ্ধে নেমে পড়বো।

দুজন ইশার নামাজ পড়তে মসজিদে গেলাম। যথারীতি আমাদের তারকীব-সমর শুরু হলো। সেদিন দুজনের মধ্যে লেগে গেলো (আল্লাযীনা) এর আলিফ-লাম নিয়ে। ওটা কি যায়েদা নাকি আসলি।

যাক নামায দাঁড়ালো। আড়চোখে দেখলাম সে ভিন্নভাবে নামায পড়ছে।

প্রথম বৈঠকে দেখলাম সাইফুল হক শাহাদাত আঙুলি ক্রমাগত নাড়ছে। ওপর-নিচ করছে। তার আঙুলটা নড়ার কারণে, বাতির আলোয় আঙুলের ছায়াটা দেয়ালে গিয়ে পড়েছে। ছায়াটা দেখে মনে হচ্ছিলো একটা পোকা নড়ছে।

আমার হাসতে হাসতে নামায ছেড়ে দেয়ার অবস্থা। কিন্তু ঘটনার এখানেই শেষ নয়। শুরু হলো মাত্র।

দেয়ালে ছায়াটাকে নড়তে দেখে কোথেকে যেন একটা টিকটিকি এলো। আস্তে আস্তে এগিয়ে ছায়াটাকে ঠোকরাতে লাগলো। আমি তখন হাসির বোম হয়ে গেলাম। টিকটিকিটা এক নাগাড়ে ঠুকরে যেতেই লাগলো। একটু পর তার ভুল বুঝতে পারলো। এবার নজর পড়লো ছায়াটার মূল কায়ার দিকে। এর মধ্যে প্রথম বৈঠক শেষ। দাঁড়িয়ে গেলাম। আড়চোখে দেখলাম টিকটিকিটা সেই আগের জায়াগাতেই আছে। অর্থাৎ সেটার লোভ যায়নি। শেষ বৈঠকে বসলাম। সাইফুল হক আবার আঙুল নাড়াতে শুরু করলো। এবার আর টিকটিকিটা ছায়ার মায়ায় ভুললো না। দেয়াল থেকে নেমে আস্তে আস্তে সাইফুলের আঙুলের দিকে এগিয়ে এলো। কাছে গিয়ে একলাফে সাইফুলের আঙুলটা কামড়ে ধরে ঝুলে পড়লো।

সাইফুল এমনিতেই তেলাপোকা আর টিকটিকিকে যমের মতো ভয় পায়। সে প্রথমে বুঝে উঠতে পারলো না বিষয়টা কি। পরক্ষণেই একটা বিকট চিৎকার দিয়ে নামায ভেঙে ওযুখানার হাউযের দিকে দৌড় দিলো। ভয়ে আশেপাশের আরো অনেকেই নামায ভেঙে ফেললো।

আমাদের পেছনে ছিলেন কারী ফরীদ সাহেব হুযুর (রহ.)। তিনি ভাবলেন আমার দুজন দুষ্টুমি করে এমন করেছি। নামাযের পর আমাদের দুজনকে ধরে গাজী সাহেব (রহ.) হুযুরের কামরায় নিয়ে গেলেন।

গাজী সাহেব হুযুর কথা শুরুর আগেই ইয়াব্বর একটা লাঠি আনিয়ে নিলেন। মুখ তো ভয়ে আমসি।

-কিরে! নামায না পড়ে কী দুষ্টুমি করেছিস কেন?

-হুযুর আমরা কোনও দুষ্টুমি করিনি।

-তাহলে?

আমি পুরো ঘটনা খুলে বললাম। ঘটনা শুনে হুযুরের সে কী হাসি! কারী ফরীদ সাহেব তো ঘটনার অর্ধেক শুনেই হাসি চাপতে চাপতে কামরা থেকে বের হয়ে গেলেন।

গাজী সাহেব হুযুর ঘটনাটা আর ভোলেননি। এমনকি দাওরার বছর, বুখারি আউয়ালের ইবারত পড়ার সময় আমাকে দেখে হুযুর তাকরীর করবেন কি, আবারও হাসিতে ভেঙে পড়লেন। বললেন:

-কিরে টিকটিকি! তুই আবার কী ইবারত পড়বি? কী অদ্ভুত ব্যাপার! সাইফুল হকও ছিলো আমার পাশেই।

জীবন জাগার গল্প: ৫৬৩

দরবেশের ছুটি

নিভৃত-নির্জন এক বনে দরবেশের খানকা। অনেক তরুণ দরবেশ রিয়াযত-মুজাহাদায় মশগুল। মুশাদাহা-মুরাকাবায় নিমগ্ন। বুড়ো দরবেশ এক শিষ্যকে ডেকে বললেন,

– বৎস! বিশেষ কাশফের মাধ্যমে আমাকে জানানো হয়েছে, তোমার আয়ু শেষ। এটা সত্য হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে।

– হুযুর! এত তাড়াতাড়ি আমি মরে যাবো? আর দুইটা দিন বাঁচা যায় না? আমি এই দুইটা দিন মনের মতো করে কাটিয়ে আসি। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে আসি।

– জন্ম-মৃত্যু কি বান্দার হাতে? আচ্ছা, দেখা যাক। আমি আল্লাহর দরবারে আবেদন জানাচ্ছি। তাঁর মর্জি হলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করতেও পারেন।

ছুটি পেয়ে শিষ্য খানকার বাইরে এলো। সাথে এতদিনকার জমানো টাকা-পয়সা বেঁধেছেঁদে নিলো। গ্রামে ঢুকতেই ছেলেবেলার এক বন্ধুর সাথে দেখা। এই বন্ধু আবার শুঁড়িখানার মালিক। দরবেশ বন্ধুকে নিজের দোকানে নিয়ে গেলো। বন্ধুর চাপে পড়ে দরবেশ মদের গ্লাসে চুমুক দিতে বাধ্য হলো। আর খাবে না, শুধু এই একবার।

মদ খাওয়ার পর দরবেশের নেশা বেশ চড়ে গেলো। আরো মদ চাইলো। নেশায় ঢুলুঢুলু দরবেশ এখানেই ক্ষান্ত না হয়ে আরো আগে বাড়লো। পাশেই ছিলো খারাপ পাড়া। তরুণ দরবেশ এবার সেখানে গিয়ে জুটলো।

এখানেই দুইদিন কাটিয়ে দিলো। সাথে আনা টাকা-পয়সাও দ্রুত ফুরিয়ে আসছিলো। দ্বিতীয় দিন রাতে একদল ডাকাত এলো সেই পাড়ায়। তারা ডাকাতির অর্থের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলো। তাদের গলা চড়তে চড়তে এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে ধুন্ধুমার মারামারি লেগে গেলো। পুরো ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলো। কয়েক ডাকাত মারা পড়লো। আশেপাশে যারা ছিলো তাদের কয়েকজনও মারা পড়লো। মৃতদের মধ্যে তরুণ দরবেশও ছিলো।

সকালে সবাই ধরাধরি করে দরবেশের লাশ বনের খানকায় পৌছে দিলো। খানকার অন্যরা তার নির্মম পরিণতি দেখে ভীষণ দুঃখ পেলো। বৃদ্ধ দরবেশ সবাইকে জড়ো করে বললেন:

– দেখো, তোমাদের এই সাথী জীবনের শেষ দুটি দিনকে ছুটি হিসেবে নিয়েছিলো। সে যা ইচ্ছা তা-ই করে বেড়িয়েছে। জীবনের একটা মুহূর্তও আসলে ছুটি কাটানোর জন্য নয়। জীবনে ছুটি বলে কিছু নেই। ইচ্ছামত কাজ করে বেড়ানোরও সুযোগ নেই। জীবনটা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়েছেন তার ইবাদত-বন্দেগী করে কাটানোর জন্য।

জীবন জাগার গল্প: ৫৬৪

দুনিয়ার হাকীকত

গভীর জঙ্গলে হাঁটছিলো এক লোক। হঠাৎ দেখলো,

– এক ভয়ালদর্শন দৈত্যকায় সিংহ তার পিছু নিয়েছে।

লোকটা প্রাণভয়ে দৌড়াতে শুরু করলো। যেতে যেতে কিছুদূর গিয়ে একটা কূপ দেখতে পেলো। আগপিছ না ভেবে কপালে যা আছে হবে, এই মনোভাব নিয়ে ঝাঁপ দিলো। পড়তে পড়তে একটা ঝুলন্ত রশি দেখে, খপ করে সেটা ধরে ফেললো। এ অবস্থায় বেশ কিছু সময় ঝুলে রইলো। উপরের দিকে চেয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেলো। অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হওয়ার যোগাড়।

= কূপের মুখেই সিংহটি থাবা গেড়ে বসে আছে। মুখ ব্যাদান করে বারবার নীচের দিকে তাকাচ্ছে, গরগর করছে। তাকে খাওয়ার উপায় খুঁজছে।

লোকটা উপরের দিক থেকে বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে নিচের দিকে তাকালো। যা দেখলো কলজে হিম হয়ে গেলো। নীচের দিকে না তাকানোই ভালো ছিলো। নীচে বিরাট এক সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে ফনা তুলে ক্রমাগত ফোঁস ফোঁস করছে আর কিছু একটার ওপর অন্ধ আক্রোশে ছোবল হানছে।

এখানেই শেষ নয়, আবার ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো, একটি কালো আর আরেকটি শাদা ইঁদুর ঝুলে থাকা রশিটা ধারালো দাঁত দিয়ে একনাগাড়ে কেটে যাচ্ছে।

এত কষ্টের মধ্যেও একটু হলেও স্বস্তির পরশ অনুভব করলো যখন দেখলো, সামনেই একটা মধুভর্তি মৌচাক। কোনমতে একহাতে শরীরের ভর সামলে মৌচাকে আঙুল ডুবিয়ে মধুটা চেখে দেখলো। লোকটা মধুর অপূর্ব স্বাদ দেখে সাময়িকভাবে বাহ্যিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে পড়লো। সবকিছু ভুলে মৌচাকের মধু চেটেপুটে খেতে শুরু করে দিল। তার মনে রইলো না ওপরের গর্জনরত সিংহের কথা। মনে থাকলো না নিচের ছোবল হানা বিষধর সাপের হা করা মুখের কথা। বেমালুম ভুলে গেলো দুইটি কুটকুটে ইঁদুরের কথাও। অথচ রশিটা আস্তে আস্তে শেষ হয়ে আসছে। যে কোনো মুহূর্তেই ছিঁড়ে যাবে।

আমাদের জীবনটাও এমনি,

– সিংহটি হচ্ছে আমাদের মৃত্যু। যেটা সারাক্ষণ আমাদের তাড়িয়ে ফিরছে।

– সাপটা হচ্ছে কবর। যা আমাদের অপেক্ষায় ওঁত পেতে আছে।

– দড়িটা হচ্ছে আমাদের জীবন। যাকে আশ্রয় করেই আমাদের বেঁচে-বর্তে থাকা।

– শাদা ইঁদুর হলো দিন, আর কালো ইঁদুর হল রাত। যারা প্রতিনিয়ত ধীরে ধীরে আমাদের জীবনের আয়ু কমিয়ে দিচ্ছে। আমাদেরকে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

– আর মৌচাক হলো দুনিয়া। যার সামান্য মিষ্টতা পরখ করতে গিয়ে আখেরাতের ভয়ানক বিপদের কথা ভুলে যাই।

জীবন জাগার গল্প: ৫৬৫

কুদস ও আমি

কুদস: অনেক বছর ধরেই তো তোমরা আমাকে বলে আসছো,

-অপেক্ষা করো, আমরা আসছি।

আমি: চিন্তা করো না। আমরা আসতে বিলম্ব করছি, কিন্তু আসবো, সত্যিই আসবো।

কুদস: আমার বর্তমান অবস্থা কি তোমাদেরকে আরো অপেক্ষা করতে বলে? আমার কান্না কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ না?

আমি: আরেকটু ধৈর্য ধরো। তুমি কি নবীজির হাদীসটা শোননি, 'ত্বরাপ্রবণতা শয়তানের পক্ষ থেকে'।

কু;দস আমি ত্বরাপ্রবণ হয়েছি? তোমরা আমার আর কতটা অপমান চাও? ইহুদিরা প্রতিনিয়ত আমার নিচে মাটি খুঁড়ে চলছে।

আমি: আমরা আসলে এই মুহূর্তে প্রস্তুতিতে আছি। চারদিক থেকে গুছিয়ে তবেই তোমার দিক রওনা দিবো।

কুদস: আমার তো মনে হচ্ছে কিয়ামতের আগে তোমাদের গোছগাছ শেষ হবে না। তুমি কি জানো না, ইসরাঈল আমার সমস্ত গেইট বন্ধ কর দিয়েছে? কাউকেই প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। অনির্দিষ্টকালের জন্য?

আমি: প্রিয় কুদস! তোমাকে বোঝাতে পারব না, এটা আমার-আমাদের ভেতরে কী লেলিহান আগুন জ্বালিয়েছে।

কুদস: যারা আল্লাহর রাস্তায় লড়ছে তারা সবাই বলছে, তাদের সবারই চূড়ান্ত লক্ষ 'আমাকে মুক্ত করা'। কিন্তু কই, আমি তো বোধহয় অন্তিম মুহূর্তে পৌঁছে গেছি।

আমি: তুমি একদম চিন্তা করবে না। দাওলাহ-নুসরার ভাইয়েরা তোমার দিকেই এগিয়ে আসবে। আসবেই। কিছু কৌশলগত সমস্যা থাকায় এগুতে পারছে না। তোমার কাছে আসতে হলে প্রথমে জর্দান দখল করতে হবে। জর্দানের রাজধানী আম্মান থেকে ইসরাঈল সীমান্ত সত্তর কিলোমিটার। তবে মিশরের ভাইয়েরা সিনাই হয়ে এগুচ্ছে। আর সিরিয়ার ভাইয়েরা দামেশক দখল করার আগ পর্যন্ত কিছু করতে পারছে না।

প্রিয় কুদস! তুমি আমাদের নয়নের মণি। তুমি আমাদের ভালোবাসার স্থান।

প্রিয় কুদস! তুমি আমাদের মর্যাদার প্রতীক। তুমি আমাদের কলিজার টুকরা।

আল্লাহুম্মাফতাহ লানাল কুদস। ওয়ানসুরিল মুজাহিদীনা ফি কুল্লি মাকান। আমীন

জীবন জাগার গল্প: ৫৬৬

ফাদারের প্রশ্নমালা

ফারহাতের বাড়ি ভারতের হায়দারাবাদে। গত দুই পুরুষ থেকেই আয়ারল্যান্ডের অধিবাসী। ডাবলিনের জেমস জয়েস ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ফারহাতের পাশের বাসায় থাকে জন ইউক্লিড। জনও একজন অভিবাসী। তার বাবা যৌবনে গ্রীস থেকে এদেশে এসেছিলো।

পাশাপাশি বাসা হওয়ার কারণে ফারহাত আর জন বলতে গেলে এক সাথেই বেড়ে উঠেছে। জন প্রতি রোববারে নিয়ম করে চার্চে যায়।

গত সপ্তাহে চার্চ থেকে বলা হয়েছে, সবাই যেন পরের সপ্তাহে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কাউকে সাথে করে নিয়ে আসে। জন কাউকে না পেয়ে ফারহাতকে নিয়ে গেলো। ফারহাতকে বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখে ফাদার থমকে গেলেন।

- তুমি এশিয়ান?
- জি। ইন্ডিয়া।
- তোমাকে কি কিছু প্রশ্ন করতে পারি?
- জি, অবশ্যই পারেন।
- প্রশ্নগুলো অবশ্য আমার নিজের নয়। আমি এক জায়গায় পড়েছি। এখন দেখি তোমার সে ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা আছে কিনা।

ফারহাত প্রশ্নগুলো শুনে মুচকি হাসলো। বিসমিল্লাহ পড়ে উত্তর দেয়া শুরু করলো। পড়ার সুবিধার্থে প্রশ্ন আর উত্তরগুলো একের পর এক সাজিয়ে দেয়া হলো।

- এমন একক সত্তা কী আছে, যার দ্বিতীয় নেই?

– আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক তার কোনও দ্বিতীয় নেই।

- এমন দু'টি বস্তু কী যার তৃতীয় নেই?

– রাত আর দিন। এ দুটির কোন তৃতীয় নেই। (আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শনরূপে সৃষ্টি করেছি)।

- এমন তিনটি বস্তু কী যার চতুর্থ নেই?

– তিন হলো মূসা (আ.) -এর আপত্তি। তিন বারের পর আর আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয় বলে খিযির (আ.) বলে দিয়েছিলেন। প্রথমবার নৌকা ফুটো করা। দ্বিতীয়বার বালক হত্যা। তৃতীয় বার দেয়াল সোজা করে দেয়া।

- এমন চারটি বস্তু কী যার পঞ্চম নেই?

– কুরআন, ইনজীল, তাওরাত, যবূর। এই চার কিতাবের বাইরে পঞ্চম কোন ধর্মগ্রন্থ নেই।

- এমন পাঁচটি বস্তু কী যার ষষ্ঠ নেই?

– পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায। ষষ্ঠ কোন ফরয নামায নেই।

- এমন ছয়টি বস্তু কী যার সপ্তম নেই?

– ছয়টা দিন। যে দিনগুলোতে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন।

- এমন সাতটি বস্তু কী যার অষ্টম নেই?

– সাত আসমান। এগুলোর কোন অষ্টম নেই।

- এমন আটটি বস্তু কী যার নবম নেই?

– আল্লাহর আরশ বহনকারী আটজন ফেরেশতা।

- এমন নয়টি বস্তু কী যার দশম নেই?

– মূসা (আ.) -এর নয়টা মু'জিযা। লাঠি, শুভ্র হাত, তূফান, দুর্ভিক্ষ, ব্যাঙ, রক্ত, উকুন, পঙ্গপাল, সমুদ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ।

- এমন দশটি বস্তু কী যার একাদশ নেই?

– নেক আমল করলে তার জন্য দশ গুণ প্রতিদান।

- এমন এগারোটি বস্তু কী যার দ্বাদশ নেই?

– ইউসূফ (আ.) -এর এগারো ভাই।

- এমন বারোটি বস্তু কী যার ত্রয়োদশ নেই?

– মূসা (আ.) -এর বারোটি কূপ ও ইহুদিদের বারোটি গোত্র।

- এমন তেরোটি বস্তু কী যার চতুর্দশ নেই?

– তা হলো ইউসূফ (আ.) -এগারো ভাই, আর তাঁর পিতামাতা।

- কোন সে বস্তু যেটা নিঃশ্বাস গ্রহণ করে, কিন্তু তার প্রাণ নেই?

– প্রাণ নেই, কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলে, তা হলো সকাল। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেছেন: (আর সকালের শপথ! যখন তা নিঃশ্বাস ফেলে)।

- কোন সে কবর, যা লাশকে নিয়ে চলাফেরা করেছে?

– লাশ নিয়ে যে কবর চলেছে, তা হলো তিমি মাছ। ইউনুস (আ.) -কে গিলে খেয়েছিলো। তারপর পেটে নিয়ে চল্লিশদিন পর্যন্ত ঘুরেছিলো।

- মিথ্যা বলেও জান্নাতে যাবে কে?

– মিথ্যা বলেছিল ইউসুফ (আ.) -এর ভাইরা। পিতার দু'আর উসীলায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

- কোন বস্তুকে আল্লাহ সৃষ্টি করেও অপছন্দ করেছেন?

– তা হলো গাধার ডাক। আল্লাহ তা'আলা সেটা নিজেই সৃষ্টি করেছেন। আবার নিজেই কুরআন কারীমে বলেছেন, নিশ্চয় নিকৃষ্টতম আওয়াজ হলো গাধার ডাক।

- আল্লাহ তা'আলা মা-বাবা ছাড়াই কোন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন?

– আল্লাহ আদম (আ.)- কে মা-বাবা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। আর সালিহ (আ.)- এর উটনী, ইবরাহীম (আ.) এর কুরবানীর দুম্বা এবং ফেরেশতাদেরকেও পিতামাতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন।

- কোন মাখলুককে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে, কাকে ধ্বংস করা হবে আগুন দিয়ে আর কাকে রক্ষা করা হয়েছে আগুন থেকে?

– ইবলিসকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে। আগুন দিয়ে ধ্বংস করা হবে আবু জাহলকে। আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন ইবরাহীম (আ.) -কে।

- কাকে পাথর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? পাথর দ্বারা ধ্বংস হয়েছে? পাথর দ্বারা রক্ষা পেয়েছে?

– পাথর থেকে সৃষ্টি করেছেন সালেহ (আ.)- এর উটনিকে। পাথর দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে আসহাবে ফীলকে। পাথর দ্বারা রক্ষা পেয়েছেন আসহাবুল কাহফ।

- কোন বস্তুকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তারপর সেটাকে বড় (গুরুতর) মনে করেছেন।

– নারীদের কৌশল আল্লাহ নিজেই সৃষ্টি করেছেন আবার সেটাকে বড় মনে করেছেন।

- কোন গাছের বারোটা শাখা। প্রতিটি শাখায় ত্রিশটা পাতা। প্রতিটি পাতায় পাঁচটা ফল। তার মধ্যে তিনটা ছায়ায় থাকে আর দুইটা রোদে?

– গাছটা হলো 'বছর'। বারোটা শাখা হলো বারো মাস। ত্রিশটা পাতা হলো ত্রিশ দিন। পাঁচটা ফল হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায। তিন ওয়াক্ত নামায ছায়াতে, মাগরিব, এশা আর ফজর। দুই ওয়াক্ত রোদে, যোহর আর আসর।

ফারহাতের উত্তর শুনে পুরো চার্চ স্তব্ধ হয়ে গেলো। ফারহাত ফাদারকে প্রশ্ন করলো:

– আপনি খ্রিস্টান হয়ে এসব প্রশ্ন কোথায় পেলেন?

– অনেকগুলো প্রশ্ন তো বাইবেল থেকেই করেছি। আর কিছু আমি কুরআন পড়ে ও বিভিন্ন বই পড়ে জেনেছি। আর সবগুলো প্রশ্ন একসাথেও কয়েক জায়গায় দেখেছি। প্রশ্নগুলো আমাদের যাজকদের ট্রেনিংয়েও শেখানো হয়ে থাকে। আর আমার অনেক প্রশ্ন বিকল্প উত্তরও ছিলো। যেমন দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিলো, এমন দুটি বস্তু কী যার তৃতীয় নেই? এখানে উত্তর রাতদিন হতে পারে, দুনিয়া-আখিরাত হতে পারে, জান্নাত-জাহান্নাম হতে পারে।

– আচ্ছা! আপনি তো আমাকে অনেক প্রশ্ন করলেন, এবার আমি আপনাকে শুধু একটা প্রশ্ন করবো। বলুন তো, জান্নাতের চাবিকাঠি কী?

ফাদার উত্তর দিতে চাইলেন না। ফারহাত অনেক পীড়াপীড়ি করলো। তবুও ফাদার নিরুত্তর রইলেন। শেষে সবার জোরাজুরিতে আর থাকতে না পেরে বললেন,

– উত্তর আমি দেব। তবে সেটা প্রকাশ্যে বা জোরে দিতে পারবো না। ফারহাতের কানে কানে চুপি চুপি দেব।

ফাদার ফারহাতের কানে কানে বললো,

– উত্তরটা হলো, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

উত্তর শুনে ফারহাতের দু'চোখ থেকে আনন্দ ঠিকরে বের হতে লাগলো। জন ইউক্লিড তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো,

– ফারহাত! বলো না, ফাদার তোমার কানে কানে কী উত্তর দিয়েছেন?

জীবন জাগার গল্প: ৫৬৭

কেমন জীবন চাই

অফিসের পক্ষ থেকে বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হলো। খেলাধুলা পর্বে একটা ইভেন্ট ছিলো রচনা প্রতিযোগিতা। বিষয় দেয়া হলো,

= কেমন জীবন চাই।

বুড়ো খোকারা যে যার মতো লিখল। কার কয়টা ফ্ল্যাট, কয়টা গাড়ি, কয়টা একাউন্ট লাগবে কলম খুলে লিখল। প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেল একটা ভিন্নধর্মী রচনা।

= আমি আগের জীবনটা ফেরত চাই যখন,

সাফল্য মানে ছিল, ভাইবোনদেরকে পেছনে ফেলে আগেই প্লেটের খাবারগুলো শেষ করতে পারা।

= আগের জীবনটা ফেরত চাই যখন,

নিরাপত্তা মানে ছিল মাকে জড়িয়ে ধরে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া।

= আমি আগের জীবনটা ফেরত চাই যখন,

বাবার কোলই ছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান। বাবা খেলাচ্ছলে ছাদ ছুঁই ছুঁই করে ছুঁড়ে মারাই ছিল আকাশ ছোঁয়া।

= আমি আগের জীবনটা ফেরত চাই যখন,

শুধু খেলার পুতুল আর খেলনা সাইকেল-গাড়িই ভাঙতো। আর কিছু ভাঙতো না।

= আগের জীবনটা ফেরত চাই যখন,

আড়ি কেটে কথা না বলার সীমা ছিল আগামীকাল সকাল।

= আমি আগের জীবনটা ফেরত চাই যখন,

আমি সবাইকে ভালোবাসতাম, আমাকেও সবাই ভালোবাসতো।

জীবন জাগার গল্প: ৫৬৮

জাদুর পানিপড়া

একজন আলিমের স্মৃতিচারণ।

আমি সামরিক বাহিনীতে ইমাম হিশেবে ছিলাম। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের সাথে আমিও আফ্রিকার কঙ্গো গিয়েছিলাম। সেখানে আমার কাজ

শুধু মসজিদেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করতে হতো। প্রাথমিক চিকিৎসার ওপর ট্রেনিং নেয়া ছিল। সেনা সদস্যদের সাথে আমিও সেবাকার্যে অংশ নিতাম।

সেখানকার লোকেরা আমাদের দলের নিঃস্বার্থ সেবা-সহযোগিতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। আমি এবং তাবলীগে চিল্লা দেয়া একজন কর্নেলের তৎপরতায়, বেশ কিছু খ্রিস্টান ভাইবোন মুসলমানও হয়েছিল। আরও অনেকেই হতে আগ্রহী ছিল।

আমাদের কর্মক্ষেত্রে আশেপাশে বেশ কিছু মুসলিম বসতি ছিল। তাদের সাথেও আমাদের বেশ ঘরোয়া সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের মসজিদে মাঝে মধ্যে গিয়ে বয়ান করে আসতাম। ততদিনে তাদের ভাষাও বেশ রপ্ত করে ফেলেছিলাম।

একদিন তাদের দাওয়াতে আমি জুমা পড়াতে গেলাম। নামায শেষে একজন এসে বলল:

-হুযুর! আপনাকে একটু আমাদের বাড়িতে যেতে হবে।

-কেন?

-আমার ছোট ভাই খুবই অসুস্থ। মুমূর্ষ অবস্থা। তাকে জাদুর আসর করা হয়েছে।

-চলো দেখি!

আমি তাদের বাড়িতে গেলাম। অসুস্থ যুবকের সাথে কথা বললাম। সে বললো,

-হুযুর! মরে যাচ্ছি। আমাকে বাঁচান। শত্রুরা আমাকে জাদু করেছে।

-তুমি জাদুর কথা কিভাবে বুঝতে পারলে?

-কারণ, সারাক্ষণ আমার মনটা বিষণ্ন হয়ে থাকে। মনে কোনও আনন্দ পাই না। মায়ের সাথে কথা বলতে ভাল লাগে না। ভাইবোনদের সঙ্গ বিরক্ত লাগে। বিয়ে করেছিলাম। বউকে বাপের বাড়িতে রেখে এসেছি। তাকে দেখলে আমার রাগ আরো বেড়ে যায়। ছোট্ট একটা মেয়ে আছে। তাকে কোলে নিতে পর্যন্ত ইচ্ছে করে না। বউ-বাচ্চার সাথে আজ অনেক দিন হলো দেখা নেই। আমার টাকা পয়সার অভাব নেই। জাতিসংঘের অধীনে একটা প্রজেক্টে ভাল বেতনে চাকুরি করি।

- তোমার অন্য কোনও রোগও তো থাকতে পারে। সেটা পরীক্ষা করিয়েছ?

-না না, আমার আর কোনও রোগ-বালাই নেই। আমার শুধু মনের সমস্যা।

কাউকে ভাল লাগে না। কারো সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

-আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

= (তোমাদের যে বিপদ দেখা দেয়, তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে দেখা দেয়: শূরা ৩০)

এই আয়াত হিশেবে বলতে হয়, নিশ্চয় তোমার কোন গুনাহ আছে। ভেবে দেখ।

-না, হুযুর! আমাকে জাদু করা হয়েছে। আমাকে একটু ফুঁক দিয়ে দিন। কোনও তদবীর থাকলে দিন।

-তুমি ভাল করে চিন্তা করে দেখ তো!

- না, আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি।

-আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পানি পড়া দিচ্ছি। তবে আগামীকাল সকালে পানিটুকু খাওয়ার আগে, রাতে শুয়ে শুয়ে আরেকটু ভেবে দেখবে, কোন গুনাহ অগোচর থেকে যাচ্ছে কিনা।

আমি ক্যাম্পে চলে এলাম। দুইদিন পর বড় ভাই ছাউনিতে এসে আমাকে খোঁজ করলো। আমি সাক্ষাতকক্ষে গেলাম।

-হুযুর! আপনার ঋণ আমাদের পরিবার কখনোই শোধ করতে পারবে না।

-কেন? তোমার ভাই ভাল হয়েছে?

-জি, শুধু তাই নয়, স্ত্রী-কন্যাকেও নিয়ে এসেছে। তাদেরকে দেখলেই মনটা ভরে যাচ্ছে। আম্মা আপনাকে এক বেলা খাবারের দাওয়াত দিয়েছেন। আপনাকে সরাসরি কৃতজ্ঞতা জানাতে চান।

আমি সময় করে, ছুটি নিয়ে দাওয়াত রক্ষা করতে গেলাম। প্রথমেই ছোট ভাইকে নিয়ে বসলাম।

-কি রে, এখন কেমন লাগছে?

-খুব ভাল লাগছে। এত ভাল আগে কখনো অনুভব হয়নি। আমি এখন আমার মা, বড় ভাই, স্ত্রী-কন্যাকে ছাড়া বাঁচার কথা কল্পনাও করতে পারি না।

-এটা কিভাবে সম্ভব হলো?

-আপনি সেদিন চলে যাওয়ার পর, আমি রাতে শুয়ে শুয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করলাম। হিশেব কষে দেখলাম, অনেক পাপ আছে, যা আমি গোপনে করি। আমার অশ্লীল ছবি দেখার অভ্যেস ছিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, আমি টিভি

রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে প্রায় রাতেই এসব দেখতাম। ওই কামরার গোপন জায়গায় অনেকগুলো 'ডিভিডি' রাখা ছিল। পাশাপাশি আমি ওসব দেখতে দেখতে মদপানও করতাম।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আমাকে এসব ছাড়তে হবে। না হলে জীবনে সুখী হওয়া যাবে না। ঘর-সংসার করা হবে না। মা-ভাইকে ভালোবাসা যাবে না।

সে রাতেই আমি সব ডিভিডি পুড়িয়ে ফেললাম। মদের বোতল খুলে সব মদ ড্রেনে ঢেলে দিলাম। কাজটা শেষ করে যখন হাত-পা ধুয়ে এলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল, আমার মনের ওপর থেকে যেন ভীষণ এক পথর নেমে গেছে।

বড় ফুরফুরে লাগছিল। সকালের অপেক্ষা না করে তখনই আপনার পড়ে দেয়া পানিটা পান করে ঘুমিয়ে পড়লাম। দীর্ঘদিন পর সেই রাতে শান্তিমতো ঘুমুতে পারলাম।

এতদিন তো নামায পড়তাম না। আল্লাহর কী মহিমা! এত রাত করে ঘুমিয়ে পড়ার পরও ফজরের আজান আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। উঠে নামায পড়লাম। মায়ের সাথে দেখা করে সাথে সাথে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে বউ-বাচ্চাকে নিয়ে এলাম।

সুখ মানে ছিল একটা চকলেট, একটা বিস্কিট, একটা আইসক্রিম।

জীবন জাগার গল্প: ৫৬৯

রিযিক

এক আরব আলিম আত্মজীবনীতে লিখেছেন,

-কায়রোতে আয়োজিত এক সম্মেলনে আমার সাথে এক আফগান রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাত হয়েছিল। তখন আফগানিস্তানে কমিউনিস্ট শাসন চলছিল। বাইরে বাইরে সবাই নাস্তিক। ভেতরে ভেতরে প্রায় সবাই আস্তিক।

আমি সেই রাষ্ট্রদূতকে কায়রোর বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলাম। বিভিন্ন বিষয়ে কথা হতো। একদিন রিযিক বিষয়ে কথা উঠলো। তিনি এক আজব ঘটনা শোনালেন। বললেন,

-আমাকে একবার রাষ্ট্রীয় কাজে, মস্কো পাঠানো হলো। বিমানে করে প্রথমে তাশখন্দ তারপর ট্রেনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কারণ তাশখন্দেও একটা কাজ ছিল।

পথে খাওয়ার জন্যে, গিন্নি দুইটা মোরগ ভূনা করে দিয়েছিল। সাথে কিছু রুটিও। তাশখন্দ পৌছে হোটেলে ব্যাগ রেখে বাইরে একটু ঘুরতে বের

হলাম। সাথে নিয়ে আসা দুইটা মোরগও নিলাম। সেগুলো তখনো ভাল ছিল। শীতের দেশ, খাবার-দাবার অত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না।

ফুটপাথ ধরে হাঁটছিলাম। ঘটনাক্রমে একজন পূর্ব পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হয়ে গেল। কুশল বিনিময়ের পর সে আমাকে খাবারের দাওয়াত দিল। আমিও সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। সাথে নিয়ে যাওয়া খাবারটা নিয়ে বেশ বিপাকে পড়লাম। রাস্তার পাশেই দেখলাম, একজন বুড়ি খুবই অসহায় অবস্থায় আছে। দেখেই বোঝা যায় অনেকটা সময় ধরে তার খাবারের কিছু জোটেনি। বেশি কিছু না ভেবে, খাবারের প্যাকেটটা ফকির বুড়িকে দিয়ে দিলাম।

দাওয়াত খেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সাথে সাথে আমাকে একটা টেলিগ্রাম দেয়া হলো। সেখানে লেখা, আমার মস্কো যাওয়ার প্রোগ্রাম বাতিল। এখুনি কাবুল ফিরে যেতে হবে।

আমি ফিরতি বিমানে বসে বসে বিস্ময়াভিভূত হয়ে ভাবতে লাগলাম:

-আসলে আমি তাশখন্দে এসেছি রিযিকের টানে। ওই বুড়ির তাকদীরে দুইটা আফগান মোরগ লেখা ছিল, সেটা পৌঁছে দিয়েছি। আর আমার কপালে একবেলা তাশখন্দের মেহমানদারি ছিল, সেটাও গ্রহণ করেছি।

জীবন জাগার গল্প: ৫৭০

হাসির স্কুল

ইথিওপিয়ার একটি গ্রাম। নাম কসোয়া। এই গ্রামের একজন যুবক। বিলাসো ঘ্রিমা। নদীতে নৌকা দিয়ে কচ্ছপ শিকার করে আর বাজারে বিক্রি করে। বিয়ের বয়েস হওয়ার পর, অনেক পছন্দ করে একটা বিয়ে করেছে। বউকে নিয়ে খুবই সুখী একটা সংসার গড়ে উঠলো বিলাসোর।

জামাই-বউ দু'জনেই একজন আরেক জনের জন্যে জানপরাণ। একজন আরেক জনকে না দু'দণ্ড তিষ্টোতে পারে না। এ নিয়ে পরিবারে তো বটেই, পাড়া-পড়শিরাও কানাঘুষা শুরু করে দিল। হলে কী হবে, বিলাসো দম্পতি নির্বিকার। তারা চুটিয়ে দাম্পত্য সুখ উপভোগ করতে লাগলো।

বলা নেই কওয়া নেই, কোনও রোগ বালাই নেই, তবুও দুম করে একদিন 'আরায়া' মানে বিলাসোর স্ত্রী মারা গেল।

বিলাসো রীতিমত পাগল হয়ে গেল। জীবনটা ছন্নছাড়ার মতো হয়ে গেল। রুজি-রোজগার থেকে মন উঠে গেল। পথে-প্রান্তরে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে পুতং বাঁশি বাজাতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়ার চরম অনিয়মের কারণে, গায়ে-গতরে আগের সেই বল নেই। হাত-পা খ্যাংরা কাঠির মতো পাটকাঠি। মুখের হাসি তো সেই কবেই হারিয়ে গেছে। নাওয়া-খাওয়া ভুলেছে আরায়ার মৃত্যুর পর।

বিলাসোর বুড়ি মা তখনো জীবিত। মা ছেলেকে জোর করে ধরে এনে শত বলে কয়ে দুয়েক লোকমা নাকেমুখে গুঁজে দেয়। বিলাসোও উবুর-থুবুর করে খেয়ে আবার পুতংয়ের সুরে মজে যায়।

বিলাসোদের ঘরে একটা বেলজিয়াম আয়না ছিল। তার বাবা যখন একটা বেলজিয়াম কোম্পানির মালিকানাধীন খনিতে কাজ করতো, এক সাহেব বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময়, এটা দিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে ওটা অবহেলা, অযত্নে ঘরের এক কোণে পড়ে আছে।

একদিন ঘরের ওপর থেকে একটা পুরনো ট্রাংক নামাতে গিয়ে বিলাসোর চোখ পড়লো আয়নাটার ওপর। হঠাৎ কী মনে হলো, একটু হাসির ভান করে দাঁতগুলো দেখলো।

বিলাসো অবাক হয়ে দেখলো, তার হাসিমাখা মুখটা খুবই সুন্দর দেখায়। ব্যাপারটা আবার পরীক্ষা করলো। আবার। আবার। বেশ কয়েকবার।

বিলাসোকে এবার হাসির রোগে পেয়ে গেল। ঘরে বাইরে সব জায়গায় সে হাসতে শুরু করে দিল। প্রথম প্রথম সবাই তাকে পাগল ভাবলেও, পরে বুঝতে পারল, এটা পাগলের হাসি নয়।

বিলাসো আরও অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, তার হাসিমুখ দেখে আশেপাশের লোকেরা আলাদা গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। বাজারে গেলে কলাটা-মুলোটা অন্যদের চেয়ে কম দামে বিকোচ্ছে। কেউবা দামও রাখতে চাইছে না।

এই অবস্থা দেখে, বিলাসোর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে একটা স্কুল খুলবে। ছোটবেলায় বেলজিয়ামের সাহেবের কাছে যা শিখেছিল, তাই বাচ্চাদেরকে শেখাবে। তবে আসল শিক্ষাটা দিবে হাসির। সে কচি শিশুদেরকে হাসতে শেখাবে। হাসির মজা বোঝাবে। হাসির উপকারিতা বোঝাবে।

.

আস্তে আস্তে তার স্কুলের নামডাক ছড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বুড়োরাও তার স্কুলে ভর্তি হতে লাগলো। তারাও হাসি শিখবে।

.

বিলাসো সবার জন্য নামমাত্র একটা ফি ঠিক করলো। এটা দিয়েই তাদের মা-বেটার সংসার ভালোই চলে যেতে লাগল। বিলাসো একটা ব্যাপার আলাদা করেছিল, গর্ভবতী মায়েদের থেকে কোনও ফি নিতো না। সে বলতো,

-একজন মা তার শিশুর সাথে হাসিমুখে কথা বলবে। হাসিমুখে আদর করবে। এটা শেখানোর জন্যে টাকা নেয়াটা পাপ।

.

কিন্তু গ্রামবাসীর ধারণা ছিল ভিন্ন। বিলাসো আসলে তার প্রাণাধিক স্ত্রীকে ভুলতে পারেনি। তাই মৃত স্ত্রীর ভালোবাসাটাই অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায়।

.

বিলাসোর নাম গিনেস রেকর্ড বুকেও উঠেছে। সে একটানা একঘন্টা হেসে বিশ্ব রেকর্ড করেছে।

.

বিলাসোর হাসি বিষয়ক একটি বক্তৃতা।

-আসুন আমরা আন্তরিকভাবে সুন্দর করে হাসির চেষ্টা করি। আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখি, আমার হাসিটুকু কেমন। অসুন্দর হলে অনুশীলন করে করে আমরা হাসিটাকে সুন্দর করে নিতে পারি। অল্প কয়েক দিনের চেষ্টাতেই একটা খারাপ হাসি সুন্দর হাসিতে পরিণত হতে পারে।

= আপনারা দেখবেন, অনেক অভিনেতা আছে, যাদের চেহারা মোটেও সুন্দর নয়, কিন্তু তাদের হাসিটা মায়াকাড়া। এটা দিয়েই তারা বাজিমাত করে।

= আর দেরি কেন, এখনি হাসির অনুশীলন শুরু করে দিন। দেখুন তো কত সুন্দর আপনার হাসি! এত সুন্দর হাসির যোগ্যতা নিয়েও কেন আপনি চারপাশের মানুষকে গোমড়া চেহারা দেখাবেন? এটা তো ভাল নয়!

=একটা সুন্দর হাসির সাহায্যেই আরো কয়েকটি সুন্দর হাসি জন্ম নেয়।

= আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন। যদি গাড়িতে থাকেন, একটু রিয়ারভিউ মিররে পচাখ রাখুন, এবার একটা হাসি দিন। সাবধান! সামনের দিকেও চোখ রাখুন, নইলে এটাই হয়ে যাবে আপনার জীবনের শেষ হাসি।

.

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমার ভাইকে দেখে তোমার দেয়া হাসিটাও একটা সদকা' (অপূর্ব উপহার)।

জীবন জাগার গল্প: ৫৭১

মহিয়সী মুজাহিদা

আযীয আটাকান। পেশায় একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ। তুর্কি সীমান্তের একটি উদ্বাস্তু শিবিরে নিয়োজিত মেডিকেল টিমের দলনেতা। এই হাসপাতালটি শুধু সিরিয়ান উদ্বাস্তুদের চিকিৎসার দিকটাই দেখে। তিনি গাযায় প্রেরিত তুর্কি টিমের সাথেও ছিলেন। তারই স্মৃতিচারণমূলক লেখা তুরস্কের একটি চিকিৎসা সাময়িকীতে ছাপা হয়েছে। তিনি বলেছেন,

-আমরা মেডিক্যাল টিমে সেদিন দায়িত্বে ছিলাম দুইজন। আমি আর রেডক্রস থেকে আসা সিনথিয়া। সিনথিয়া নরওয়ের মেয়ে। সেখানেই পড়াশোনা করেছে। অসলোর এক মেডিকেল কলেজে। ঘটনাক্রমে আমরা দু'জন দু'দেশের হলেও একই ব্যাচের ইন্টার্নি।

.

সেদিন ছিল মঙ্গলবার। রুগির চাপ ছিল বেশ। বাশশার আসাদ সীমান্তের একটি জনপদে প্রচণ্ড বিমান হামলা চালিয়েছে। শত শত আহত। এটা সিরিয়া সংকটের শুরুর দিকের ঘটনা।

.

আড়াই বছরের একটা শিশুকে, আমি আর সিনথিয়া মিলে ব্যান্ডেজ করে দিলাম। আরও অনেক শিশুকেই দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হলো। দম ফেলার ফুরসত নেই। স্রোতের মতো আহত-যখমী আসছে তো আসছেই। থামার আলামত নেই।

.

পরদিন রাউন্ডে গেলাম। গতকালের শিশুটাকে বেশ টনটনে দেখলাম। শিশুটার প্রাণশক্তিও মা-শা আল্লাহ। বৃহস্পতিবার সোয়া এগারটার দিকে,

একজন নার্স হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিল 'অমুক' শিশুটার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

সিনথিয়া আগেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। শিশুটার বুকের ওপর বিশেষ কায়দায় চাপ দিয়ে মালিশ করে দেয়া। ঘড়ি ধরা প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটেরও বেশি সময় একটানা চেষ্টার পর শিশুটার হৃদযন্ত্র সচল হলো। ঘটনাটা অবিশ্বাস্য বটে, কিন্তু চোখের সামনে ঘটেছে বলে বিশ্বাস করতে হচ্ছে। সিনথিয়া আনন্দে কেঁদে ফেলল। আমি জোরে শ্বাস ছেড়ে আল হামদুলিল্লাহ বললাম। আশেপাশে উৎকণ্ঠিত হয়ে, জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নার্সদের মুখেও স্বস্তির রেখা ফুটে উঠল।

হৃদযন্ত্র কাজ করতে শুরু করলেও, শিশুটার অবস্থা মোটেও আশংকামুক্ত ছিল না। কারণ শিশুটার কণ্ঠনালীকে দুর্বোধ্য এক কারণে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল। আমরা তো মনে করেছিলাম সে আসলেই মারা গিয়েছিল।

সিনথিয়াকে দায়িত্ব দিলাম, শিশুটার মা অথবা বাবাকে ডেকে আনতে। আমাদের আইসিইউতে জায়গা না থাকায় একান্ত আপনজনকেও থাকতে দেয়া হতো না। একটু পরে সিনথিয়ার সাথে, একজন বোরখা পরা মহিলা এল। আমি শিশুটার গুরুতর পরিস্থিতি যতটা সম্ভব রেখেঢেকে বললাম।

আমরা ভেবেছিলাম মা তার সন্তানের কথা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠবেন। আমাদেরকে দোষারোপ করবেন। অবাক করা ব্যাপার, তিনি এসবের কিছুই করলেন না। সিনথিয়ার দিকে তাকিয়ে আস্তে অথচ স্পষ্ট স্বরে দুইটা শব্দ উচ্চারণ করলেন,

-আলহামদুলিল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ।

তিনি আর দেরি করলেন না। চলে গেলেন।

আমি আর সিনথিয়া থ! এ কেমন মা?

দশদিন পর শিশুটি নড়াচড়া করতে শুরু করলো। তার মস্তিষ্কের অবস্থাও বেশ ভাল। কিন্তু দু'দিন পর আকস্মিক কারণে তার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া আবার বন্ধ হয়ে গেল। আগের সেই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ পৌনে এক ঘণ্টার ম্যাসাজের পরও কোনও কাজ হচ্ছিল না। আজ শিশুটির মাও আমাদের সাথে ছিল। আমি তাকে বললাম,

-আজ আর আশা নেই। আপনি মানসিকভাবে প্রস্তুত হোন।

মা অকম্পিত স্বরে বললেন,

-আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া আল্লাহ! তার আরোগ্যের মাঝে কল্যাণ নিহিত থাকলে তাকে সুস্থ করে দিন।

মায়ের দু'আর পরই শিশুটির হৃদযন্ত্র আবার সচল হলো।

.

এরপর আরও সাতবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। আমাদের টিমের সব ডাক্তারের কাছে এই শিশু আর তার মা আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো। অন্য টিমের ডাক্তাররাও এই বিরল ধরনের রুগি শিশুটিকে দেখতে আসছিল। আমাদের ভাগ্য ভাল, রেডক্রসের টিমে একজন দক্ষ অভিজ্ঞ বয়স্ক ডাক্তার ছিলেন। তিনি দীর্ঘ এগার ঘণ্টা একটানা চেষ্টা করে, ছেলেটার কণ্ঠনালীর রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পেরেছিলেন।

.

তিনমাস চলে গেল। শিশুটা আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থার দিকে ফিরে আসছিল। বিপত্তি ঘটল হঠাৎ। ছেলেটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যেতে শুরু করলো। হুড়দুম পরীক্ষা করে জানা গেল, তার মস্তিস্কে টিউমার হয়েছে। সেটা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পুঁজ বেরোচ্ছে। আমরা দিশেহারা হয়ে পড়লাম। এমনটা কোথাও হয়েছে বলে শুনিনি। সিনথিয়া তো শিশুটির মাকে বলেই ফেলল,

-আপনার ছেলে আগের অবস্থা থেকে অলৌকিকভাবে উন্নতি লাভ করলেও এই ভয়াবহ টিউমার থেকে বাঁচার কোনও আশা নেই।

মা সেই আগের মতো নিরাবেগ কণ্ঠে বললেন,

-আলহামদুলিল্লাহ। তিনি যা করেন ভালো বুঝেই করেন।

.

আবার সেই অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম। তিনি চরম ধৈর্য ধরে অপারেশন চালালেন। টিউমার বের করা হলো। শিশুটি একটা ঘোরের মধ্যে আছে। প্রায় সাত সপ্তাহ পরে তার কিছুটা উন্নতির লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করলো।

.

আমরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম। এত কিছুর পরও যখন শিশুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে, আর কোনও সমস্যা হবে না। আমাদের স্বস্তিকে ভুল প্রমাণ করার

জন্যেই কিনা জানি না, পরদিন শিশুটির শরীরের অবস্থা আবার অবনতি দেখা দিল। রক্ত পরীক্ষায় ধরা পড়লো, তার রক্তে বিষাক্ত একটা উপাদান ছড়িয়ে আছে। তার শরীরের তাপমাত্রা বিপদজনকভাবে ৪১% তে নেমে এল। আমি তার মাকে বললাম:

-বাচ্চার অবস্থা চরম নাজুক। আর কোনও আশা নেই। আপনি দু'আ করুন।

মা সেই আগের মতোই পর্বতপ্রমাণ সবর ইয়াকীনের সাথে বললেন,

- আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া আল্লাহ! তার আরোগ্যের মাঝে যদি কল্যাণ নিহিত থাকে তাহলে তাকে সুস্থ করে দিন।

.

এই মহিয়সী মা দিনরাত সন্তানের পাশে থেকে নীরবে সেবা করে যাচ্ছিলেন। পাশের বেডে আরেকটি শিশু ছিল। সেও যখমী ছিল। তার মা সারাক্ষণই হাউমাউ করে কাঁদছিল আর হা-হুতাশ করছিল। আমি তার কাছে গিয়ে বললাম,

-পাশের বেডটার দিকে একটু দেখুন। কোথায় আপনি আর এই অন্যলোকের মানুষটা কোথায়!

শিশুটার তাপমাত্রা আস্তে আস্তে কমে আসছে। আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। মা'কে মানসিক প্রস্তুতি নিতে বললাম। তিনি সেই আগে মতোই স্থির-অকম্প,

- আলহামদুলিল্লাহ। জাযাকুমুল্লাহ।

.

চার মাস কেটে গেল। চতুর্থ মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে ছেলেটির রক্তের বিষাক্ত উপাদান দূর হয়ে গেল। পঞ্চম মাসের শুরুতে একদিন বাচ্চাটার প্রচণ্ড জ্বর এল। পাশাপাশি বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ব্যাথা। সাথে সাথে বুকটা আগুনের মতো গরম হয়ে উঠলো। শেষে বাধ্য হয়ে, ঝুঁকিপূর্ণ এক অপারেশন করতে হয়। সবাই পরামর্শ দিল, হৃদযন্ত্রটা বিশেষ উপায়ে বের করে রাখতে হবে। উত্তাপ কমা পর্যন্ত। তাই করা হলো। দেখতেও কেমন যেন গা শিউরে উঠতো। কিন্তু এত কিছুর পরও সেই মা, চুপচাপ ছেলের সেবা করে যাচ্ছেন। নামায পড়ছেন। কুরআন তিলাওয়াত করছেন। আমাদের সাথে লেগে আছেন।

.

এভাবে সাড়ে ছয় মাস কেটে গেলো। বাচ্চাটা নড়চড়া করে না। হাসে না। কাঁদে না। কথা বলে না। দেখে না। শোনে না। তার বক্ষটা এখনো খোলা।

শুধু দেখা যায় তার হৃদযন্ত্র ধুকপুক করে নড়ছে। তার মিটমিটে প্রাণের অস্তিত্বের ঘোষণা দিচ্ছে।

.

আমরা শিশুটির ওয়ার্ডে যেতে সংকোচবোধ করতাম। সিনথিয়া তো মা'য়ের অবিচল ধৈর্য দেখে সারাক্ষণ ছানাবড়া চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করতো আর মাথা নাড়তো। বিড়বিড় করে বলতো,

-নাহ, এ স্রেফ অসম্ভব। একজন মানুষ, একজন মা এতটা শক্তিমান হতে পারে না। এটা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

.

আরও আড়াই মাস কেটে গেল। কী থেকে কী হয়ে গেল আমরা টেরও পেলাম না। শিশুটা দ্রুত উন্নতি করতে শুরু করলো। একদম ভোজবাজির মতো। তরতর করে সুস্থ হয়ে উঠলো। অবশ্য একদিনেই পায়ের ওপর খাড়া হয়ে যায়নি। তবুও অস্বাভাবিক গতিতেও তার অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল। আস্তে আস্তে শিশুটির সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এল।

.

বাচ্চাটা রিলিজ হওয়ার দিন আমাদের কেউ কাঁদছিল, কেউ হাসছিল। পুরো হাসপাতাল ভেঙে পড়েছিল, সেই অনন্য অসাধারণ মা'কে বিদায় দিতে। সিনথিয়া কোনও কথাই বলতে পারছিল না। সে কেবল মা'য়ের হাত চেপে ধরে রেখেছিল। বাচ্চার মা হাসপাতাল ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে আমাকে একটা কথা বলে গেলেন:

-আল্লাহ আপনাকে উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন।

আমি বুঝতে পারলাম না। এমন দু'আ তো আরও হাজার মানুষেই আমার জন্যে করেছেন। কিন্তু তার কথাটা আমার মধ্যে এতই প্রভাব ফেলেছে যে, আমার মুখ দিয়ে কোনও বাক্য সরছিল না।

আর মহিলা এত কঠিন পর্দানশীন যে, দীর্ঘদিন হাসপাতালে ছিলেন, কিন্তু কোনও পুরুষ ডাক্তার বা ওয়ার্ডবয় তার চেহারা দেখেছে বা তাকে দু'চোখ তুলে কারো দিকে তাকাতে দেখেছে, এমন কথা কেউই বলতে পারবে না।

.

আরেকটা বিষয় আশ্চর্যের ছিল, এতকিছু হয়ে গেল, বাচ্চাটির বাবার দেখা পাইনি। সিনথিয়া জিজ্ঞেস করেছিল। মহিলা বলেছে,

-ছেলের বাবা সিরিয়ায় আছেন। কাজে ব্যস্ত। এখন আসতে পারবেন না।

দ্বিতীয় পর্ব

ছেলেটির কথা আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। দেড় বছর পর। একদিন অফিসে বসে কাজ করছিলাম। রুগিদের ফাইলপত্তর ঘাঁটছিলাম। একজন বয় এসে বললো,

-আপনার সাথে একটা পরিবার দেখা করতে চায়।

অফিস থেকে বের হয়ে এলাম। ভীষণ অবাক হয়ে দেখলাম, খালিদ দাঁড়িয়ে আছে। মানে সেই অসুস্থ শিশুটি। সাথে তার বাবা-মা। খালিদকে দেখে আমি খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। বাবার কোলে আরেকটি বাচ্চা। হাসপাতালের করিডোরে খালিদের ছোটাছুটি দেখে মনেই হচ্ছিল না, সে দীর্ঘ প্রায় অর্ধ বছরেরও বেশি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছে।

.

সিনথিয়াকে ডেকে পাঠালাম। সে এসে খালিদ আর তার পাশে বোরখা পরা মহিলা দেখে, বিহ্বল হয়ে পড়লো। ছুটে এসে, খালিদের মাকে জড়িয়ে ধরল। আমি খালিদের আব্বুকে সাথে নিয়ে অফিসে এলাম। কৌতূহলে যেন ফেটে পড়ছিলাম। তার পরিচয় জানার জন্যে। এমন শ্মশ্রুমণ্ডিত সুদর্শন দীর্ঘ পেটানো শরীর কমই দেখা মেলে। ছোট্ট মেয়েটি তখনো তার কোলে শান্ত পুতুলটি হয়ে ঘুমুচ্ছিল।

.

দু'জনের আলাপ জমে উঠলো। তার নাম কুতাইবা। শিক্ষিত। মার্জিত। রুচিবোধসম্পন্ন লোক। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়েস। সে তুলনায় সন্তানদের বয়েস কম। এক পর্যায়ে রসিকতা করে জানতে চাইলাম,

-কোলেরটা কত নম্বর, নয় না দশ?

প্রশ্ন শুনে তার দু'ঠোঁটে কান্নার চেয়েও করুণ একটা হাসি ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। উত্তরে যা বললেন তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি বললেন,

-কোলে যাকে দেখছেন সে আমাদের দ্বিতীয় সন্তান। আপনি আমাদের বয়েসের সাথে সন্তানের সংখ্যা বোধহয় মেলাতে পারছেন না। আমাদের প্রথম সন্তান খালিদ বিয়ের সতের বছর পর জন্ম নিয়েছে।

-ও আচ্ছা, সেজন্যই কি আপনার স্ত্রী সন্তানের প্রতি এতটা ধৈর্যশীল?

-না, আপনি তো খাদীজা, মানে খালিদের মা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। সে অতি উচ্চ পর্যায়ের একজন মানুষ। তার মতো ইবাদতগুজার,

তাহাজ্জুদগুজার, ধৈর্যশীল, স্বামী-সন্তান-শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি যত্নশীল আর শ্রদ্ধাশীল মহিলা আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।

এই যে এতটা বছর আমাদের কোনও সন্তান ছিল না, একটা দিনও তার মধ্যে কোনও ধরনের অস্থিরতা দেখিনি। আল্লাহর প্রতি অনুযোগ দেখিনি।

আশেপাশের অনেকেই অনেক কথা বলতো, তাকে একটিবারের জন্যেও বিচলিত হতে দেখিনি। রাগ করতে দেখিনি। আমাদের বিয়ের বয়েস উনিশ বছর চলছে। এই দীর্ঘ সময়ে তাকে আমি একদিনের জন্যেও তাহাজ্জুদ ছাড়তে দেখিনি। এমনকি নামায নিষিদ্ধের সময়েও সে তাহাজ্জুদের সময় উঠে মনে মনে যিকির করতো।

.

মেয়েদের মধ্যে তো পরচর্চা ও মিথ্যার প্রচলন থাকে, খাদীজার মধ্যে এসব কখনো দেখিনি।

.

হাতের শত কাজ থাকলেও, সে সবসময় কাজের লোক না পাঠিয়ে, নিজেই হাসিমুখে দরজা খুলে দিত। হাসিমুখে বিদায় দিত। আমাকে নিজ হাতে পোশাক পরিয়ে দিত। ম্যাগাজিন পরিয়ে দিত।

-ম্যাগাজিন পরিয়ে দিত মানে?

-ওহহো! মুখ ফস্কে বের হয়ে গেল। যা হোক, আপনাকে বলা যায়। আমি জাবহাতুন নুসরার সাথে আছি। এখন ছুটিতে এসেছি। খাদীজাও ছুটিতে আছে।

-তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, আপনার স্ত্রীও.....

-জি। সে আমার চেয়েও ভাল এবং দক্ষ মুজাহিদ। আপনি হয়তো লক্ষ করেছেন, সে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। সেটা বাশশার বাহিনীর ছোঁড়ার গুলির আঘাতের কারণে।

.

আমি তো মেশিন গান ঠিকমতো চালাতে পারি না। একে-৪৭ই আমার কাছে বেশি ভাল লাগে। কিন্তু সে প্রায় সবধরনের অস্ত্রেই সমান সচ্ছন্দ। তবে মূলক্ষেত্র হলো স্নাইপিং।

.

আপনি হয়তো জানেন, একজন স্নাইপারের সবচেয়ে বেশি যে গুণটার প্রয়োজন হয়, তা হলো অবিচল ধৈর্য। এটা যে তার মধ্যে কতটা আছে, সেটা তো আপনার অজানা থাকার কথা নয়।

.

এমনও হয়েছে, আমরা দু'জনে একটা বাড়ির ছাদে এ্যামবুশ পেতে বসেছি ইশার নামায পড়ে। দু'জনেই রাইফেলের টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ লাগিয়ে মড়ার মতো পড়ে আছি। রাত গভীর হলে কখন যে ঘুম আমার দু'চোখ জড়িয়ে আসতো টেরও পেতাম না।

মাঝরাতে বা শেষ রাতে ঘুম ভাঙলে দেখতাম খাদীজা সেই আগের মতো অনড়, অকম্প আছে। কিছুই নড়ছে না। চোখদু'টো স্থির তাকিয়ে আছে। শুধু ঠোঁটদু'টো নড়ছে। যিকির করছে বা কুরআন তিলাওয়াত করছে।

.

সে একজন ভাল হাফেযা। এভাবে সারারাত একটানা তিলাওয়াত করে প্রায় পুরো কুরআনই পড়ে ফেলতো।

জিহাদের আয়াত এলে, তার আঙুলটাকে নিশপিশ করে উঠতে দেখতাম। একটা নুসাইরি-আলাভি শিয়া সৈন্য দেখলেই হয়েছে।

তার তাক সাধারণত মিস হতো না। প্রায় এক কিলোমিটারের চেয়েও বেশি দূরের টার্গেটও সে কয়েকবার ফেলেছে।

.

খাদীজার বাবাও একজন মুজাহিদ ছিলেন। আমার শ্বশুর একজন শহীদ। বাশশারের বাবা হাফেয আল আসাদের সৈন্যরা তাকে ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝরা করে শহীদ করে দিয়েছিল।

.

বাবার কাছ থেকেই মেয়ে জিহাদের দীক্ষা পেয়েছে। আর মহৎ গুণগুলো পেয়েছে আমার শাশুড়ির কাছ থেকে।

.

মাঝেমধ্যে মনে চিন্তা আসে,
-এত বড় একটা মানুষের ভালোবাসা আমার কপালে জুটলো কিভাবে? কিভাবে পেলাম এই স্বর্গীয় মানুষটাকে? আমি খাদীজাকেও কয়েক বার প্রশ্নটা করেছিলাম। উত্তরে শুধু মিটিমিটি হাসে।

জীবন জাগার গল্প: ৫৭২

দুই মায়ের পার্থক্য

স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বিয়ে করবো না করবো না করেও সবার চাপাচাপিতে আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছে খলীল সাহেবকে। সারাদিন অফিসে থাকতে হয়। বাচ্চা ছেলেটাকে দেখার কেউ নেই। ছেলে অবশ্য তার দাদুর কাছেও থাকতে পারতো। তাহলে গ্রামে থেকে লেখাপড়া ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। তাছাড়া কাছ ছাড়াও করতে মন সায় দেয়নি।

সপ্তাহে ছুটির দিনটাই ছেলের সাথে ভালোভাবে কাটানোর সুযোগ হয়। সেদিন বাপ-বেটায় নানারকম সুখ-দুঃখের আলাপ হয়। সেদিন কথায় কথায় ছেলের কাছে জানতে চাইলেন,

-নতুন মা কেমন?

-ভালো?

-আগের মা আর এই মা'য়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

-আগের মা মিথ্যা কথা বলতেন আর এই মা সবসময় সত্য কথা বলেন।

ছেলের কথা শুনে বাবা বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন,

-যে মা তোমাকে জন্ম দিল সেই মা মিথ্যাবাদী আর যেই মা কয়েক মাস হলো এসেছে, সে সত্যবাদী হয়ে গেল কিভাবে?

-আগের আম্মু বলতেন, খোকা! বেশি দুষ্টুমি করবে না। খেলার জন্য বেশি দূরে যাবে না। গেলে মার খাবে। কিন্তু আমি যতই দুষ্টুমি করতাম আম্মু মারতেন না। আর খেলতে খেলতে অনেক দূরে চলে গেলেও আমাকে খুঁজতে পাঠাতেন। আমি এলে আমার সাথেই দুপুরের ভাত খেতেন।

আর এই মা সবসময় বলেন,

-অপু! দুষ্টুমি করবে না। বেশি দুষ্টুমি করলে ভাত খেতে দেব না।

সত্যি সত্যিই আমি দুষ্টুমি করলে তিনি ভাত খেতে দেন না। এই গত রাতেও আমি ভাত খেতে পারিনি। দাদুর সাথে মোবাইলে একটু বেশিক্ষণ কথা বলেছিলাম। আম্মু বলেছিলেন দুই মিনিটের বেশি কথা না বলতে।

জীবন জাগার গল্প: ৫৭৩

চার দিরহামের দু'আ!

একজন ধনী লোক। ভোগ-বিলাসেই সময় কাটতো। দেদার আয়-রোজগার ছিল। এন্তার ছিল ব্যয়। নামায-কালামের কোনও ঠিক-ঠিকানা ছিল না। বাড়িতে নাচ-গান লেগেই থাকতো। প্রতি সন্ধ্যায় বসতো বাঈজি-মাহফিল। একটানা চলতো নিশিরাত পর্যন্ত।

চাকর-বাকরও দুপুরবেলাটা ঘুমিয়ে রাতের ফুট-ফরমাশের জন্যে তৈরী হতো। হরদম এটা-ওটা আনা-নেয়া করতে হতো। কেউ বাজারে, কেউ শুঁড়িখানায়, কেউবা নহবতখানায়, কেউবা 'অন্যখানায়' দৌড়াচ্ছে সারাক্ষণ।

.

মনিব আজ বিশেষ এক ঠুমরি বাঈজিকে আনিয়েছে। রাতভর মজলিস আজ গুলজার হবে। সুরা-উড়না উড়বে। ব্যস্ততাও আজ বেশি। বাঈজির বায়নাক্কাও অনেক বেশি। নাচের ঘুঙুর বেঁধে সে আবদার করলো, তার জন্যে বিশেষ এক শরবত আনাতে হবে। শহরের নির্দিষ্ট দোকানে সেটা পাওয়া যায়, দামটা অবশ্য একটু বেশিই। চার দীনার!

.

মনিব সাথে সাথে বিশ্বস্ত অনুচরকে ডেকে পাঠালেন:

-এই নে চার দীনার! শরবতটা নিয়ে ঝটপট চলে আয়!

.

চাকর বাজারে দৌড়ে লাগালো। হাঁপাতে হাঁপাতে যাচ্ছে। সবাই বসে আছে। সে ফিরে এলেই টুঙটাঙ শুরু হবে। বাঈজি বড় নখরা করছে আজ। মসজিদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে চাকর। সামনে পড়লো মলিন পোশাকের এক দরবেশ। বলা নেই, কওয়া নেই, দরবেশ আচমকা সামনে এসে দু'হাত মেলে পথরোধ করে দাঁড়ালো।

-এ্যাই! কোথায় ছুটছিস?

-মনিবের শরবত আনতে!

-ঠিক ঠিক বল, শরবত কার জন্যে?

-বাঈজির জন্যে।

-কত দিয়েছে তোকে?

-চার দীনার!

-দীনার চারটা আমাকে দিয়ে দে, তোর জন্যে চারটা দু'আ করবো!

-এই নিন!

-ঠিক আছে, তোর চাওয়াগুলো বল!

.

অনুচর ভয়ে ভয়ে মনিবের বাড়িতে ফিরে এল। আজ আর নিস্তার নেই। কোন ভূত যে তাকে পেয়েছিল, কেন যে লোকটার কথা বিশ্বাস করতে গেল? এখন কী হবে? দু'আ যদি কবুল না হয়?

.

পায়ে পায়ে সদর দরজা পেরুলো। তখনো মজলিস গমগম করছিল। লোকজনের আনাগোনা আগের মতোই আছে। মনিবের চোখ পড়লো তার ওপর।

-কিরে শরবত আনতে এতক্ষণ লাগে? তোর হাত খালি কেন?

-হুযুর! মসজিদের সামনে ঘটনাটা ঘটেছে। আমি শরবতটা আনতে পারিনি!

-কী ঘটনা?

.

অনুচর সব খুলে বললো। সবকথা শুনে মনিবের দুই চোখ ভাঁটার মতো লাল হয়ে গেলো। অনুচর ভাবলো, আজই তার পৃথিবীর শেষ দিন। কিন্তু মনিব হঠাৎ শান্তস্বরে জানতে চাইলেন,

-তা চারটা দু'আ কী ছিল?

-প্রথমে আমি বলেছিলাম: আমি একজন স্বাধীন মানুষের মতো বাঁচতে চাই!

-তাই? ঠিক আছে তোকে আযাদ করে দিলাম। দ্বিতীয় দু'আ?

-মনিবকে ফেরত দেয়ার জন্যে যাতে আমার কাছে চারটা দীনার থাকে!

-তাই? ঠিক আছে। এই নে চার হাজার দীনার! তৃতীয় দু'আটা কী চেয়েছিলি?

-আল্লাহ তা'আলা যেন, আপনাকে তাওবা নসীব করেন?

-তাই? ঠিক আছে। এখুনি তাওবা করলাম। আর চতুর্থ দু'আটা?

-আমি দরবেশকে বলেছি, আল্লাহ যেন আপনাকে, আমাকে ও আমাদের সাথে থাকা সবাইকে মাফ করেন!

-সুন্দর বলেছিস! এটা আমার সাধ্যে নেই। এটা তো একমাত্র গাফুরুর রাহীম করতে পারেন! আমরা অপেক্ষা করতে পারি!

আসর ভেঙে দেয়া হলো। মনিব অন্য মানুষে পরিণত হলেন। রাতের বেলা মনিব ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় একটা আওয়াজ শুনতে পেলেন,

-তুমি তোমার সাধ্যমত ছিল করেছো! তুমি কি মনে করো, আল্লাহর দায়িত্বে থাকা বাকীটা থেকে যাবে?

জীবন জাগার গল্প: ৫৭৪

একবেলা আহার

যাবো মুহাম্মাদপুর। ঠিক মধ্যদুপুর। মাথার ওপর গনগনে সূর্য। ছাতিফাটা রোদ্দুর। প্রচণ্ড দাবদাহে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত গলে যাওয়ার যোগাড়।

মাদরাসা থেকে বের হয়েই রিকশার খোঁজে নামলাম। এই গরমে কেউ যেতে চাইছে না। ভাবলাম বড় রাস্তায় উঠলে পাওয়া যাবে। এই ভেবে একটু এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর যাওয়ার পরই দেখলাম, একজন হাড় জিরজিরে রিকশাচালক বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

-এই ভাই, যাবেন?

-না যামু না। খিদা লাগছে। ভাত খামু।

সামনের দিকে হাঁটা দিলাম।। পেছন থেকে ডাক এলো,

-আহেন। বহেন। যাই।

ভাড়া ঠিক করে উঠে বসলাম। দেখলাম সত্যিই বেচারার ক্ষুধা লেগেছে। প্যাডেল চাপতে পারছে না। মুখ হাঁ করে হাঁপাচ্ছে। আমার ভেতরটা অন্যরকম এক অনুভূতিতে ছেয়ে গেলো। আর থাকতে না পেরে জানতে চাইলাম,

-ভাই! আপনার একবেলা খাবার খেতে কত টাকা লাগে?

-কত আর লাগবে, এই ধরেন পঞ্চাশ টাকা? না না ষাইট টাকা, এই বেশির থেকে বেশি সত্তুর টাকা?

আমি আর কিছু বললাম না। গন্তব্যে পৌঁছে, বেচারার হাতে সত্তর টাকা তুলে দিলাম। আমার নির্ধারিত ভাড়া ছিলো ত্রিশ টাকা। প্রথমে যখন বললাম আপনি টাকাটা রাখেন, বেচারা বুঝে উঠতে পারেনি। পরে আবার বললাম- এই আমাদের মাদরাসার পক্ষ থেকে আপনাকে একবেলা খাবারের দাওয়াত। এই টাকাটা দিয়ে, আপনি একবেলা খেয়ে নেবেন। তখন বেচারা কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন,

-বাজান! আমার কাছে এই দুপুরে খাওনের কোনও টাকাই ছিলো না। শরীরে জ্বর লইয়াই বাইর হইছি। আবার এত ক্ষুধা লাগছিলো যে, নতুন আরেকটা খেপ মারমু হেই ক্ষমতাও ছিলো না। আপনি যদি ন্যায্য ভাড়া ত্রিশ টাকাই দিতেন সেই টাকায় আমার দুপুরের খাওন জুটতো না। এখন আল্লাহই আপনারে দিয়া আমার দুপুরের খাওনের ব্যবস্থা কইরা দিছে।

মানুষের এমন সরল স্বীকারোক্তিতে চোখের পানি আটকে রাখা মুশকিল। তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচলাম।

জীবন জাগার গল্প: ৫৭৫

আরবের পরিণতি

মিশরের প্রাণ হলো নীলনদ। সেই প্রাচীনকাল থেকেই। এই নদের উৎপত্তি হয়েছে আফ্রিকার উগান্ডা সেন্ট্রালের ভিক্টোরিয়া ঝিল থেকে। নীলনদের পানির সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল রুয়ান্ডা নদী। ২০১১ সালে ইথিওপিয়া সরকার ৪.৮ বিলিয়ন ডলার ব্যায়ে "গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেজিস্টেন্স ড্যাম" নামে ইথিওপিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবহমান নীল নদের উপর ড্যাম নির্মাণ শুরু করে। যার নির্মাণ কাজ শেষ হবার কথা ২০১৭ সালে।

শুরু থেকেই মিশর সরকার এই ড্যাম নির্মাণের বিরোধিতা করে আসছে। সর্বশেষ ৩রা জুন ২০১৩ সালে প্রেসিডেন্ট মুরসি ঘোষণা দেন,

-প্রয়োজনে এই ড্যাম ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধ করবো। ঘোষণার কয়েক সপ্তাহ পরই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন।

মালহামা মহাযুদ্ধের পূর্বে ক্ষয়ক্ষতি বা ধ্বংসের ব্যাপারে কিছু হাদিসকে খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারি। শহর-নগরীর ধ্বংস বা ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ বিষয়ক যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে 'খারাবুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটি পুরোপুরি হোক বা আংশিক সবধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা ধবংসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

হযরত মাসজুর ইবনে গায়লান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন,

-"সবার আগে ধ্বংস হওয়া ভূখণ্ড হল বসরা (বর্তমান ইরাকে) ও মিশর"। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কারণে তাদের ধ্বংস নেমে আসবে; ওখানে তো অনেক বড় বড় সম্মানিত ও বিত্তবান ব্যক্তিরা আছেন?' উত্তরে আবদুল্লাহ

ইবনে সামিত (রাঃ) বললেন, "রক্তপাত, গণহত্যা ও অত্যাধিক ক্ষুধা। আর মিশরের সমস্যা হল নীলনদ শুকিয়ে যাবে আর এটিই মিশরের ধ্বংসের কারণ হবে"। (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯০৭)

যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক দখলের পর থেকে আজ পর্যন্ত সেখানকার রক্তপাত, গণহত্যা ও অত্যাধিক ক্ষুধা সম্পর্কে সবাই ওয়াকিবহাল। আর জুলাই ২০১৩ তে মুরসির ক্ষমতাচ্যুতির পরে মিশরের রক্তপাত ও গণহত্যা সম্পর্কেও সবার জানা আছে। এখন অপেক্ষা নীলনদের করুণদশার।

হযরত ওহাব ইবনে মুনব্বিহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেছেন,

-"মিশর ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত জাযিরাতুল আরব (বর্তমান সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও ইয়েমেন) নিরাপদ থাকবে। কুফা (বর্তমান ইরাকে) ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে না। মহাযুদ্ধ সংগঠিত হয়ে গেলে বনু হাশিমের এক ব্যক্তির হাতে কুস্তুনতূনিয়া (বর্তমান ইস্তাম্বুল) জয় হবে"। (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮৮৫)

এখানেও মহাযুদ্ধের পূর্বে সর্বপ্রথম মিশর ও ইরাকের ধ্বংস বা ক্ষতির কথা বলা হয়েছে এবং এই ভূখণ্ডগুলোর (ইরাক ও মিশর) ধ্বংস বা ক্ষতির আগ পর্যন্ত জাযিরাতুল আরব (বর্তমান সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, ওমান) এর নিরাপদে থাকার কথা বলা হয়েছে। আর এই জাজিরাতুল আরবের প্রাণকেন্দ্র হেজাযেই মুসলিম বিশ্বের দুই প্রাণপ্রিয় নগরী মক্কা ও মদীনা অবস্থিত।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত; আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

-"বাইতুল মাকদিসের আবাদ হওয়া মদীনার ক্ষতির কারণ হবে। মদীনার ক্ষতি মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করবে। মহাযুদ্ধ কুস্তুনতূনিয়ার (ইস্তাম্বুলের) বিজয়ের কারণ হবে। কুস্তুনতূনিয়া বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের কারণ হবে"।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসের বর্ণনাকারীর (অর্থাৎ- স্বয়ং তাঁর) উরুতে কিংবা কাঁধে চাপড় মেরে বললেন,

-"তোমার এই মুহূর্তে এখানে উপবিষ্ট থাকার বিষয়টি যেমন সত্য, আমার এই বিবরণও তেমনই বাস্তব"। (সুনানে আবী দাউদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১১০; মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৪৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা)

'বাইতুল মুকাদ্দাসের আবাদ হওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য ওখানে ইহুদীদের শক্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া (ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই ঘটনাটি ঘটে গেছে)। এখন ইহুদীদের নাপাক দৃষ্টি পবিত্র মদীনার উপর নিবদ্ধ। প্রকৃত ঈমানদারগণ ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্র বুঝে ফেলেছে।

এভাবে তখন থেকে শুরু হওয়া কুফর ও ইসলামের লড়াই এখন দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

(সংগৃহিত ও কিছুটা পরিবর্তিত)

জীবন জাগার গল্প: ৫৭৬

বাবার দেনা!

ছেলেটা ভাল। ব্যস্ত জীবন কাটালেও, বাবা-মায়ের প্রতি বেশ খেয়াল রাখে। যখন যা প্রয়োজন এনে দেয়। মৌসুমে কলাটা, আপেলটা এনে হাজির করে। ডাক্তার-হাসপাতালেও সানন্দে দৌড়াদৌড়ি করে!

.

সবার মুখেই তার প্রশংসা। লোকটা খুবই মা-বাবা ভক্ত! বাবা-মাও ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট। অন্তর দিয়ে ছেলের জন্যে দু'আ করেন। সব সময়। সবার প্রশংসা আর স্বীকারোক্তি দেখে ছেলের মনে চিন্তা এল,

-আমি বৃদ্ধ বয়েসে যেভাবে তাদের খেদমত করছি, তারাও কি শৈশবে এভাবে আমার সেবাযত্ন করেছেন? মনে হয় না। আমি তো চাইলেই তাদের ঋণ পরিশোধ করতে পারি। বাবার কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লো,

-আব্বু! আমি শৈশবের ঋণ পরিশোধ করতে চাই! তোমরা আমার জন্যে যা করেছ, তার কয়েকগুণ বেশি ফিরিয়ে দিতে চাই!

.

বাবা ছিলেন বুদ্ধিমান। বুঝতে পারলেন, সরাসরি কিছু বললে ছেলে মনে কষ্ট পাবে আর ছেলের ভুলও ধারণাও ভাঙবে না। কিছু করলে, কৌশলে করতে হবে। তিনি বললেন,

-ঠিক আছে বাবা। তুই চেষ্টা শুরু কর। এমনিতেই তো অনেক করছিস আমাদের জন্যে।

-তা করছি বৈকি! বলো, এখন কী খেতে ইচ্ছে করছে!

-খুব বেশি কিছু নয়। আপেল খেতে ইচ্ছে করছে।

-এ আর এমন কী!

-এই নাও আপেল! কত্তোগুলো খেতে পারো দেখ!

-এখানে খেতে ইচ্ছে করছে না। ছাদে উঠে খোলা আকাশের নিচে বসে খেতে পারলে ভালো লাগবে!

-চলো!

-না রে, এখন হেঁটে ছাদে যেতে পারবো না! পায়ে ব্যথা করে।

-চলো আমি কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছি।

.

-এবার খাও!

-খাচ্ছি!

.

বাবা আপেলটা না খেয়ে ছাদ থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেললেন। ছেলে তাড়াতাড়ি আপেলটা নিয়ে এলো। সাথে আরও আপেল নিয়ে এলো। বাবা আপেলগুলো হাতে নিয়ে একটার পর একটা নিচে ফেলতে লাগলেন। ছেলে ছোটাছুটি করে এনে দিতে লাগলো। কয়েকবার ওঠানামা করার পর ছেলের হাঁফ ধরে গেলো। চেহারায় রাগের চিহ্ন ফুটে উঠলো। থাকতে না পেরে ঝাঁঝের সাথেই বললো,

-না খেতে চাইলে রেখে দাও! এভাবে ছোট ছেলের মতো ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলছো কেন?

-তুমিও যখন ছোট ছিলে, তখন তুমিও ছাদ থেকে এভাবে অসংখ্যবার খেলনা বল ফেলে দিয়েছিলে! আমি তো কোনদিন রাগ করিনি! একদিন দু'দিন নয়, বছরের পর বছর। সে তুলনায় আমি তো মাত্র একদিন করলাম!

জীবন জাগার গল্প: ৫৭৭

পাঁচ মিনিট!

পার্কে কচি-কাঁচারা খেলছে। দুলছে। ছোটাছুটি করছে। হৈ চৈ করছে। হই-হুল্লোড় করছে। একপাশের বেঞ্চিতে দু'জন বৃদ্ধ বসে আছেন। খোশগল্প-মিষ্টি অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে মগ্ন। একটু পরপর দু'জনেই ক্রীড়ারত শিশুদের দিকে তাকাচ্ছে। মুচকি হেসে আবার আলাপচারিতায় ডুবে যাচ্ছে।

.

-ওদের মধ্যে আপনার কেউ আছে?

-জ্বি। ওই যে নীল ফ্রক পরা, মাথায় লাল ফিতে-মেয়েটা আমার নাতনি। রাফিয়া। আপনার কে আছে?

-আমারও নাতি আছে। শাদা জামা পরিহিত ডানদিকের ছেলেটা।

.

কিছুক্ষণ পর এক বৃদ্ধ জোরে হাঁক দিলেন,

-রাফিয়া! চলো, অনেক খেলা হয়েছে!

ছোট্ট রাফিয়া খরগোশের মতো ছুটে এসে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরলো। আবদারের সুরে বললো,

-আর পাঁচ মিনিট দাদুভাই!

-ঠিক আছে।

.

পাঁচ মিনিট পার হলো। শিশুরা তখনো খেলছে। ঘড়ি দেখে আবার হাঁক দিলেন,

-রাফিয়া! এবার যাবে তো!

-আর পাঁচ মিনিট দাদু!

-ঠিক আছে!

.

এভাবে কয়েকবার হলো। পাশের বৃদ্ধ থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলেন:

-আপনি তো খুব ধৈর্যশীল! বিরক্ত না হয়ে নাতনিকে বেশ সময় দিচ্ছেন!

-ব্যাপারটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখলে এমনই মনে হবে! নাতনিকে সময় দিচ্ছি! বাস্তবে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো!

-কিভাবে?

-আমার নাতনিটা এতিম। ওর বাবা মানে আমার ছেলেটা এক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আমি তাকে সময় দিতে পারিনি। তার সাথে কখনো খেলিনি। তাকে নিয়ে কখনো কোথাও বেড়াতে যাইনি। তার হাত ধরে পার্কে আসিনি।

ছেলের সাথে এক ঘরে বসবাস করেও, কোনও সম্পর্ক ছিল না। দু'জন মুখোমুখি হলে উভয়েই আমরা অস্বস্তিতে পড়ে যেতাম। মনে হতো অপরিচিত কেউ। উভয়েই পালিয়ে বাঁচতাম।

.

ছেলে মারা যাওয়ার পর নাতনিকে সময় দিতে গিয়ে বুঝতে পারছি, জীবনে অনেক বড় ভুল করে ফেলেছি। যদি ছেলের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরী করতে পারতাম, তার সাথে মন খুলে কথা বলতে পারতাম, তাহলে কে জানে, ছেলের হয়ত এমন করুণ পরিণতি হত না। অন্ততপক্ষে সে কোথায় যায়, কী করে এসব তো জানতে পারতাম। দ্বি-পাক্ষিক বিদঘুটে সম্পর্কের কারণে, তার জীবনটা আমার কাছে সবসময় অস্পষ্টই ছিল। বিয়ের পর আরও ধোঁয়াশা হয়ে গিয়েছিল। তার বেপরওয়া-উদ্দাম জীবনের কথা আমি ঘূর্ণাক্ষরেও টের পাইনি।

.

নাতনিটার ক্ষেত্রে আমি আর ভুল করতে চাই না। সন্তানের সাথে সময় কাটানোর আনন্দ আগে টের পাইনি। এখন বুঝতে পারছি, জীবনের হিশেবে ভুল হয়ে গেছে।

ভাই! আপনি ভাবছেন আমি নাতনির আবদারে ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছি? জি না। আসলে আমি উপভোগ করছি! সে যখন বাড়তি আরও পাঁচ মিনিট সময় চাচ্ছে তখন আমি মনে মনে কল্পনা করছি, এই পাঁচ মিনিট তোমার বাবাকে দেয়ার কথা ছিল। দিতে পারিনি। এখন তোমাকে দিচ্ছি! যদি কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়! যদি মনের অপরাধবোধ কিছুটা কমে আসে!

জীবন জাগার গল্প: ৫৭৮

দুঃসাহসী গোয়েন্দা!

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.)। প্রধান সেনাপতি। কাদেসিয়া-যুদ্ধ। পারসিকরা বিপুল সংখ্যাক সেনা নিয়ে ময়দানে এসেছে। বিপক্ষদলের তিনি সঠিক খবর জানার জন্যে সাতসদস্য বিশিষ্ট গোয়েন্দা-দল পাঠালেন।

.

কিছুদূর যাওয়ার পর, দেখা গেল একটু সামনেই পারস্য বাহিনী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ছয়জন মনে করলো আর সামনে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। ফিরে গেল। একজন থেকে গেনেল।

.

বীরদর্পে এগিয়ে চললেন। চেষ্টা করলেন পারস্যবাহিনীর সাথে মিশে যেতে। ছোট্ট একটা পানির নহরের কাছে লুকিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। আস্তে আস্তে পা বাড়ালেন।

.

শত্রুসেনাদের অগ্রগামী দলকে পাশ কাটালেন। সেখানে ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার বাহিনী। ধীরে ধীরে মধ্যভাগও নিরাপদে পেরোলেন। চলতে চলতে দুধ শাদা এক বিরাট তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছলেন।

.

বুঝতে পারলেন তিনি সেনাপতি রুস্তমের খীমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। রাত আরও গভীর হওয়ার অপেক্ষা করলেন। অন্ধকার গাঢ় হলে, তলোয়ারের ডগা দিয়ে তাঁবুর একপাশ কেটে ফেললেন। উঁকি দিয়ে দেখলেন ভেতরে রুস্তম উপবিষ্ট। সাথে অন্য সেনা কর্মকর্তারাও আছে। শলা-পরামর্শে মগ্ন।

.

এই সুযোগে আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে ছুট দিলেন। উদ্দেশ্য পারসিক বাহিনীকে ভ্যাবাচেকা খাইয়ে দেয়া। তাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া। তারা নিজেদের সুরক্ষিত নিবাসেও নিরাপদ নয়, এমনটা ভাবতে বাধ্য করা। ফলে তাদের মনোবল ভেঙে যাবে।

.

তিনি ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটছেন। পেছনে হা রে রে করে শত্রুরাও ধেয়ে আসছে। বাবরি উড়ান গতিতে অশ্ব উড়ছে। যখন দেখলেন শত্রুরা বেশ পিছিয়ে পড়ছে, নিজের গতি কমিয়ে দিলেন। কাছাকাছি এলে আবার জোরে ছুটতে শুরু করেন।

.

এভাবে দৌড় খেলা খেলতে খেলতে মুসলিম বাহিনীর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। পেছনে জোঁকের মতো সেঁটে আছে শেষতক তিন ঘোড়সওয়ার। পাল্টা আক্রমণ করে দুইজনকে ধরাশায়ী করলেন। তৃতীয়জনকে গ্রেফতার করে নিয়ে চললেন। তিনি পেছন থেকে বর্শা বাগিয়ে আছেন। মজুসি সৈন্য আগে আগে।

.

সোজা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাসের খীমায়! অগ্নিপূজক সৈন্য বেশ

চালাক-চতুর! মুসলিম সেনাপতির সামনে গিয়েই বললো,

-আমাকে 'আমান'-নিরাপত্তা দান করুন। আপনারা যা করতে বললেন করবো!

-ঠিক আছে, তোমাকে এক শর্তে আমান দেয়া হলো। যাহা বলিবে সত্য বলিবে!

-জি।

-এবার তোমাদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত বলো।

-তার আগে আমাকে বন্দী করে আনা মানুষটা সম্পর্কে বলতে চাই!

-কী বলতে চাও?

-আমি ইহজিন্দেগীতে তার মতো বীরপুরুষ দ্বিতীয়টি দেখিনি। ছেলেবেলা থেকেই আমি যুদ্ধবিদ্যায় সবক নিতে শুরু করেছি। একজন লোক শত্রুসেনার ব্যূহ ভেদ করে, সেনাপতির তাঁবু ফুঁড়ে, তার ঘোড়া ছিনিয়ে আনতে পারে এটা কখনো কল্পনাতেও স্থান পায়নি।

এরপর ঘটলো আরও বিস্ময়কর ঘটনা। পিছু নিলো তিন সেনা। প্রথম জনকে মনে করা হতো এক হাজার পারসিকের সমান। দ্বিতীয়জন সম্পর্কেও আমাদের মধ্যে এমন ধারণা ছিলো। তারা ছিল আমার চাচাত ভাই। তাদের হত্যার পর আমাদের মনে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল। পুরো পারস্য বাহিনীতে আমার সমকক্ষ আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মানুষটার সামনে পড়ে একেবারে ভেড়া বনে গেলাম। মরার ভয়ে স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব মেনে নিলাম। তার মতো যদি আপনাদের বাহিনীতে আরও থাকে, এই বাহিনীকে পরাজিত করে কার সাধ্যি!

.

আল্লাহর খাস রহমতে বন্দী লোকটা ঈমান এনে মুসলমান হয়ে গেল। সেই অসম সাহসী, অকুতোভয় গোয়েন্দা বীর কেশরীর নাম:

= তুলাইহা বিন খুয়াইলিদ আলআসাদী।

জীবন জাগার গল্প: ৫৭৯

জানা-শোনা= অশান্তি!

এক.

উচ্চ বেতনে চাকুরি করা এক যুবক আরেক গরীব যুবককে প্রশ্ন করলো:

-কোথায় চাকুরি করো?

-একটা ম্যাচ ফ্যাক্টরিতে।

-স্যালারি কতো?

-পাঁচ হাজার।

-মোটে পাঁচ হাজার?

-চলো কিভাবে? তোমার মালিক তো অবিচার করছে। তোমার যা যোগ্যতা, হেসে-খেলেই তুমি অনেক টাকা বেতন পেতে পারো।

.

যুবকের মেজাজ খাট্টা হয়ে গেলো। নিজের কাজের প্রতি, বসের প্রতি বেজায় রুষ্ট হয়ে উঠলো। পরদিন গিয়ে সরাসরি বসকে জুলুমের কথা জানালো। কথা কাটাকাটি হওয়ায় বস তাকে চাকরিচ্যুত করলো। যুবকটি এখন বেকার।

.

দুই.

-তোমার প্রথম সন্তান হলো বুঝি?

-জি।

-তোমার স্বামী এ উপলক্ষ্যে তোমাকে কিছু দেয়নি? উপহার বা এ জাতীয় কিছু?

-না। কেন দিবে? এ তো আমাদেরই সন্তান! টাকা দিতে হবে কেন?

-কেন, তোমাকে হাত খরচার জন্যেও তো দু'চার পয়সা দিতে পারে। তার কাছে তোমার কোনও মূল্য নেই? তুমি কি চাকরানি?

.

স্ত্রীর মনে ধরলো কথাটা। সারাদিন কথাটা ভাবতে ভাবতে মনটা বিষিয়ে উঠলো। সত্যিই তো! আমাকে একটা টাকাও কখনো ছোঁয়ায় না! রাতে কর্মক্লান্ত স্বামী ঘরে ফিরলো। স্ত্রীর মুখ দিয়ে বোমা বিস্ফোরিত হলো। লেগে গেলো দু'জনে। কথা কাটাকাটি। ঝগড়া। হাতাহাতি। শেষ পর্যন্ত তালাকে গিয়ে গড়াল।

.

তিন.

-এই বৃদ্ধ বয়েসে কষ্ট করছেন? ছেলে ঢাকায় থাকে। বড় চাকুরি করে শুনেছি। বউ-বাচ্চা নিয়ে থাকে। আপনাদের দু'জনকে নিয়ে যেতে পারে না? আপনাদের দেখতেও তো আসে না!

-না না, ছেলে আমার খুবই ব্যস্ত। টাকা পাঠায় তো। ফোনে খোঁজ-খবর নেয়। নিয়মিত।

-কী এমন ব্যস্ততা তার শুনি? নিজের জন্মদাতা-দাত্রীকে দেখতে আসার সময় হয় না?

-সারাদিন অফিস-বাসা করতে করতেই সময় চলে যায়!

-আপনি খোঁজ নিয়েছেন? সে ঢাকায় বাড়ি-গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে, আর আর আপনারা অজ পাড়া গাঁয়ে ধুঁকছেন?

.

বৃদ্ধ বাবা বাসায় এসে স্ত্রীকে খুলে বললো। স্ত্রীও বাধা দিলো,

-আপনি ভুল শুনেছেন। সে আসলেই ব্যস্ত।

-নাহ, খন্দকার সাহেব কি মিথ্যা বলতে পারেন? আহারে! কাকে বুকের রক্ত পানি করে বড় করলাম?

.

কিছু নিরীহ প্রশ্ন আমাদের সুখী জীবনকে এক লহমায় দুঃখী করে দিতে সক্ষম। ছদ্মবেশী দরদীরা নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবনে অশান্তির দাবানল জ্বালিয়ে দেয়।

-কেন আপনিও সেটা এখনো কিনেননি?

-আপনাদের এখনো বাচ্চাকাচ্চা হয়নি?

-এই জীবন কিভাবে বহন করে চলেছেন?

-ছেলেকে বিশ্বাস করে বসে আছেন?

-ছেলে তো বউয়ের কেনা গোলামে পরিণত হয়েছে!

.

গল্পের নির্যাস:

= ফাসাদ সৃস্টিকারী হয়ো না। হিংসুকদের ছলনায় পড়ো না।

.

গল্পের হিতোপদেশ:

= মানুষের ঘরে অন্ধ হয়ে প্রবেশ করো। বোবা হয়ে বের হয়ে আসো!

জীবন জাগার গল্প: ৫৮০

বাবার সেবা!

বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন। চলাফেরা করতে পারেন না। তিন ছেলেই সেবাযত্ন করে। দেখাশোনা করে। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, বুড়ো বাবা আর বেশিদিন বাঁচবেন না। বাবার প্রতি ছোট ছেলের টানটা একটু বেশি। ভাইদের কাছে

আবেদন করলো,

-আমি শেষ ক'টা দিন একা একা বাবার খেদমত করতে চাই!

-না, তা হতে পারে না। তুমি একা একা সব সওয়াব নিয়ে যাবে!

-আমাকে সুযোগটা দিলে, আমি 'মিরাস' নেব না! তোমরাই আমার ভাগেরটা নিয়ে নিও!

-তাই! তাহলে ঠিক আছে।

.

স্বামী-স্ত্রী মিলে বাবার নিবিড় সেবাযত্ন করলো। বাবা খুব আরামে শেষ দিনগুলো কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। মারা যাওয়ার আগে পুত্রবধূর হাতে গোপনে তিনটা চিরকূট দিয়ে গেলেন। পরপর তিনদিনে সেগুলো খুলতে বললেন।

পরদিন প্রথম চিরকূট খোলা হলো। লেখা আছে, অমুক স্থানে কিছু মোহর রাখা আছে। সেগুলো তুলে নিও। তোলা হলো। সততার কারণে বড় দুই ভাইকে খবরটা জানাতে ভুললো না।

-তুমি মিরাস নিবে না বলেছিলে না! তাহলে মোহরগুলো তোমার পাওনা নয়। আমাদেরই প্রাপ্য।

পরদিন আরেকটা চিরকূট খোলা হলো। এবারও আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। ছোট ছেলে মন খারাপ করে ভাইদের বাড়ি থেকে ফিরে এল।

.

তৃতীয় চিরকূট খোলা হলো।

= বাবা! অমুক স্থানে একটা মোহর রাখা আছে। সেটা নিয়ে আসবো। তারপর আমার পালঙ্কের নিচে মাটি খুঁড়ে দেখবে।

.

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে মোহরটা নিয়ে এল। আগের মতোই ভাইদের কাছে গিয়ে সংবাদ জানালো।

-মাত্র একটা মোহর? এটা দিয়ে আমরা কী করবো? যাও এটা তোমাকে দিয়ে দিলাম!

.

বিষণ্ন মনে বাড়ি ফিরছিল ছেলে। এক বুড়ি দুইটা বড় বড় মাছ নিয়ে বাজার থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরছে।

-বুড়ি মা কাঁদছ কেন গো!

-আর বলো না, কত কষ্ট করে মাছদু'টো ধরলাম। কিন্তু বাজারে বিকোল না। তুমি নেবে?

-আমার কাছে মাত্র একটা মোহর আছে।

-মোহর! এ যে আশাতীত মূল্য? তুমি এক মোহর দিয়ে মাছদু'টো কিনবে?

-জি।

বউ মাছ কুটতে বসলো। প্রথমটার পেট কাটার পর বিরাট একটা মোহর বের হলো। দ্বিতীয় মাছের পেট থেকে আরেকটা বের হলো। আনন্দে আটখানা হয়ে স্বামীকে বললো। মনে পড়লো বাবা খাটের তলা খুঁড়তে বলেছেন। জামাই-বউ দৌড়ে ঘরে এল। মাটি খুঁড়ে দেখা গেলো একটা মাটির ঘড়া। মুখটা বন্ধ। ওপরে একটা চিরকূটে লেখা আছেঃ

-অতি প্রয়োজন ছাড়া এটা খুলো না। এটার কথা কাউকে বলো না!

জীবন জাগার গল্প: ৫৮১

জান্নাতের চাবি

মিশরে তখন খেদিভ ইসমাঈলের শাসন চলছে। কী এক প্রয়োজনে শায়খ মুহাম্মাদ আবদুহুকে খেদিভ ডেকে পাঠালেন।

শায়খ গিয়ে দেখলেন দু'জন লোক আগে থেকেই বসে আছে। পোষাক দেখে বুঝলেন, একজন ইহুদী রাব্বী, আরেকজন খ্রিস্টান পাদ্রী।

.

খেদিভ সবার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বললেন। তারপর বললেন,

-আমি জানতে চাই, কে জান্নাতে যাবে? ইহুদি নাকি খ্রিস্টান নাকি মুসলমান?

ইহুদি রাব্বী বললেন,

-আমার আগে পাদ্রী সাহেব মতামত পেশ করলে ভাল হয়।

পাদ্রী বললেন,

-সবার আগে শায়খ আবদুহু তার মতামত পেশ করলে ভাল।

.

শায়খ আবদুহু বললেন:

-যদি ইহুদিরা জান্নাতে যায়, তাহলে মুসলমানরাও জান্নাতে যাবে। কারণ তাদের মতো আমরাও মুসা (আ.) -কে নবী মানি।

আর যদি খ্রিস্টানরা জান্নাতে যায় তাহলে মুসলমানরাও যাবে, কারণ আমরাও তাদের মতো ঈসা (আ.) -কে নবী হিশেবে মানি।

আর যদি মুসলমানরা জান্নাতে যায়, তাহলে খ্রিস্টান-ইহুদিরা কিছুতেই জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিশেবে মানে না। আর জান্নাতে প্রবেশের চাবি হলো,

= লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

সমাপ্ত। আলহামদুলিল্লাহ।